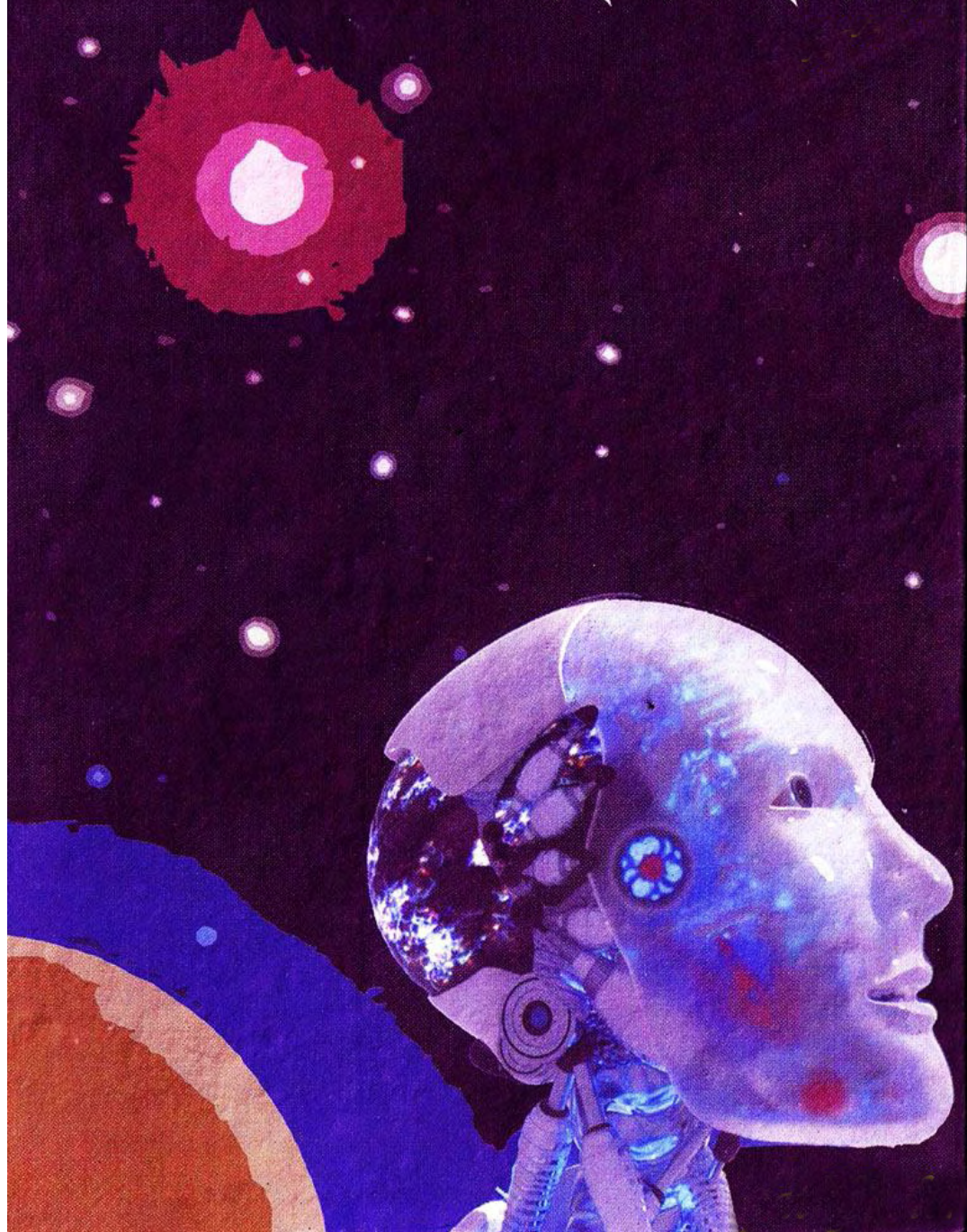


# সূর্য যেখানে নীল

আহসান হাবীব



সূর্য যেখানে নীল  
আহসান হাবীব

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

তাম্রলিপি-১৭৬

পরিচালক  
তাসনোভা আদিবা সৈঁজুতি

প্রকাশক  
এ কে এম তারিকুল ইসলাম  
তাম্রলিপি  
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ  
আহসান হাবীব

কম্পোজ  
সৃজনী  
৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ  
জে. এ. প্রেস  
৭৪ সুখলাল দাস লেন ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১২০

---

**SURJO JEKHA NE NIL**

By : Ahsan Habib

First Published : February 2012, by A K M Tariqul Islam

Director : Tasnova Adiba Shanjute, Tamralipi, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 120                      \$ : 5

ISBN : 984-70096-0176-7

## উৎসর্গ

আহসান কবীর

আহসান কবীর

দুজনেই আহসান কবীর (কবীর)। তবে একজন দীর্ঘহিকার একজন রিসসিকার।

দুজনের প্রচুর মিল, দুজনেই ভালো সাংবাদিক, দুজনেই ভালো লেখা,

দুজনের মাথায়ই চুলের ক্রাইসিস...দুজনেই আগে সামরিক লাইনে ছিলেন...

দুজনেই... এরকম অনেক কিছুই দুজনেই...

এবং দুজনেই আমার প্রিয় মানুষ।

ভূমিকা

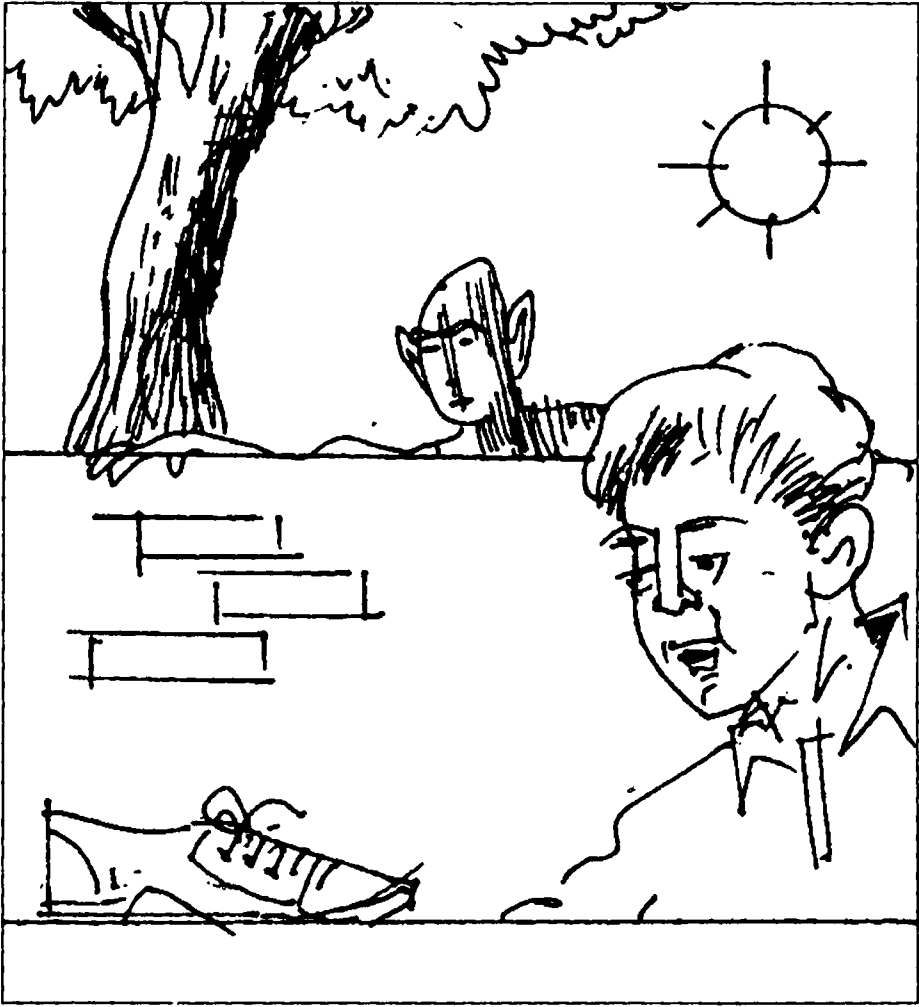
প্রতিবারই বলি আমার সায়েন্স ফিকশন আসলে ‘সায়েন্স ফ্রিকশন’ অর্থাৎ গল্পে সায়েন্সের একটু ফ্রিকশন আছে... অর্থাৎ একটু ঘর্ষণ আছে। তবে এবারের গল্পগুলোতে মনে হচ্ছে ঘর্ষণ একটু বেশি আছে পাঠকদের ভাল লেগে যাওয়ার পয়েন্ট ইনফিনিটি সম্ভবনা...।

সবাইকে একুশের শুভেচ্ছা...

আহসান হাবীব  
পল্লবী, ঢাকা।

## সূচি

পল্টুর বন্ধু	১১
গুচ্ছ অন্ধ	১৬
আফজাল সাহেবের দুই সংসার	২০
প্রজেক্ট ব্রেন এ্যাকোয়ার	২৯
তানিমের দুই সীম	৩৪
জঙ্গলের মানুষেরা	৩৯
এ্যালিয়েন	৪৩
বিগ ব্যাঙ	৫০
সূর্য যেখানে নীল	৫৪
তারা এসেছিল...	৬২
অটিস্টিক	৬৮
সিসটেম ম্যান	৭৪



## পল্টুর বন্ধু

পল্টুকে নিয়ে খুব হাসাহাসি হচ্ছে। যদিও হাসির কারণ মোটেই পল্টু নয়। বিষয়টা নিয়ে বাসার সবাই বেশ মজা পেয়েছে। মজার ঘটনাই বটে। কাণ্ডটা অবশ্য ঘটিয়েছেন পল্টুর বাবা। তিনি ঈদে পল্টুর জন্য নতুন জুতো এনেছেন। পায়ের মাপ নিয়ে গিয়েছিলেন। অফিস থেকে ফেরার পথে জুতো কিনে এনেছেন। পল্টুর অবশ্য তার বাবার পছন্দের উপর অগাধ বিশ্বাস। বাবা অফিস থেকে ফিরেই হাক দিলেন—

পল্টু তোর ঈদের জুতো

পল্টু ছুটে এল। সঙ্গে এল ভার্টিসিটিতে পড়ুয়া বড় বোন রায়না। আর ক্রাশ টেনের ভাই সাকিব। পল্টুর নতুন জুতো নিয়ে তাদের আগ্রহও যেন কম নয়।

বাহ্ ভালোইতো জুতা কিনেছ বাবা। প্রথম মন্তব্য করে মেয়ে।

ডিজাইনটা খারাপ না। বাবার রুচি ভালো হচ্ছে দিনকে দিন। ভাইয়ের কमेंট।

নে এখন পায়ে দিয়ে দেখ মাপ ঠিক আছে কিনা। পাশ থেকে মা বলেন।

যার জুতো সে অবশ্য আর দেরি করল না ডান পায়েরটা পরে বাম পায়েরটা পায়ে ঢুকানোর চেষ্টা করছে... আর তখনই হটাৎ বড় ভাই-বোন এক সাথে হাসিতে ফেটে পড়ল। মা'র বুঝতে একটু দেরি হল তবে বিষয়টা বুঝে তিনিও হাসতে শুরু করলেন। সব শেষে পল্টুও হেসে ফেলল। অপ্রস্তুত বাবা কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকালেন একে একে সবার দিকে।

কি হল তোরা হাসছিস কেন?

বাবা তুমি এখনও বুঝতে পারলে না? হি হি হি

না, কি? সমস্যাটা কোথায়? আর হটাৎ... তিনিও বিষয়টা ধরতে পারলেন। তিনি আসলে দুটোই ডান পায়ের জুতো কিনে এনেছেন। এটা কেমন করে হল? তারতো ভুল হওয়ার কথা না। জুতোঅলাদেরও হওয়ার কথা না, ওরা তো প্রফেশনাল। ... আসলে একই ডিজাইনের বেশ কয়েক জোড়া দেখার কারণে... হয়ত

ঠিক আছে প্যাকেটে ভরে রাখ কাল বদলে আনব'খন। বাবা বিরশ মুখে বলেন।

যা একটা কাণ্ড করনা তুমি। স্ত্রী হাসি থামিয়ে রান্নাঘরে ঢোকেন চা করতে। বিকেলের চা দেওয়ার সময় হয়েছে। পল্টুর বাবা আফজাল সাহেব ভিতরে ভিতরে লজ্জা পান... এটা একটা কিছু হল? দুটো ডান পায়ের জুতা কিনে নিয়ে এলেন তিনি?... ধুৎ! নিজের উপর প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে বাথরুমে ঢোকেন তিনি।

পরদিন আফজাল সাহেব জুতা জোড়া নিয়ে যেতে ভুলে যান। ফিরে এল পল্টুর মা মনে করিয়ে দেন।

তুমি জুতো জোড়া বদলে আনলে না? পরে ঈদের বন্ধ শুরু হয়ে গেলে কিন্তু দোকান আর খোলা পাবে না। বিপদে পড়বে তুমি।

কালই যাব। অফিসে যাওয়ার সময় মনে করিয়ে দিও।

পরদিন আর ভুল করেন না। জুতার বাক্স নিতে গিয়ে দেখেন বাক্স জায়গায় নেই। পল্টুকে ডাকা হল

জুতোর বাক্স কই?

আমার ঘরে।

যাও নিয়ে এস বদলাতো হবে।

লাগবে না।

লাগবে না মানে?

আমি ডান পায়েরটা বাম পায়ে করে নিয়েছি।

মানে? মা-বাবা দুজনেই অবাক।

আমার এক বন্ধু আছে ও ঠিক করে দিয়েছে।

তোমার বন্ধু জুতো ঠিক করে দিয়েছে মানে? কে সে?

ঐ যে বাড়ির পিছের ঝোপটার কাছে মাঝে মাঝে আসে ও... খুব ভালো...

বাবা-মা দুজনই হতভম্ব হয়ে যান। ক্লাশ থ্রিতে পড়ুয়া পল্টু এসব কি বলছে!

দেখি জুতো দুটো আন দেখি। পল্টু এক ছুটে গিয়ে নিয়ে এল। সত্যিই জুতো ঠিক আছে ডান আর বাম দুটো দুই রকম জুতো। পল্টু পরেও দেখাল। দু পায়েই চমৎকার ফিট হয়েছে।

এটা কিভাবে হল? তোমার বন্ধু কে সে?

বললাম তো... ঐ বাড়ির পিছের ঝোপটার কাছে মাঝে মাঝে আসে ও... রোগা লম্বা চোখ নীল। কানদুটো যেন কেমন মিকি মাউসের মতো... বলে ছোট পল্টু হি হি করে হাসে।



চিন্তিত বাবা-মা তখনই তাকে নিয়ে বাড়ির পিছনের ঝোপের কাছে গেলেন। কই কোথাও কেউ নেই। সবচে বড় কথা ঝোপের পিছনে দেয়াল। কাউকে আসতে হলে দেয়াল টপকে আসতে হবে। কে সে, যে পল্টু তাকে বন্ধু বলে দাবি করছে?

চিন্তিত বাবা অফিস বাদ দিয়ে পল্টুকে নিয়ে পড়লেন। পল্টুর ছোট মামাও তখন ঘটনাচক্রে এসে হাজির হয়েছে। শুরু হল পল্টুর জেরা।

বাবা পল্টু ঠিকঠাক বলবে।

বললাম তো।

বলো তো তোমার বন্ধু লোকটা দেখতে কেমন?

লম্বা।

কত লম্বা?

তোমাদের চেয়ে লম্বা।

তুমি বলেছ লোকটার কান দুটো মিকিমাউসের মতো।

হু।

ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কিভাবে?

ঐ ঝোপের কাছে খেলছিলাম বলটা দেয়ালের ওপাশে পড়ে গেল। তখন ও এনে দিল।

তোমার সাথে কথা বলল?

হু...

তোমার জুতো কিভাবে ঠিক করল বলতো? এবার প্রশ্ন করে মামা।

ওকে বলেছিলাম জুতার কথা। তখন ও বলল আমাকে দাও ঠিক করে দিচ্ছি।

তারপর?

তারপর ও জুতো নিয়ে চলে গেল। একটু পর ফিরে এল। দেখি ডান পায়েরটা বাম পায়ের হয়ে গেছে।

তাই? পল্টু দেখে মামার চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে। ‘তুই জিজ্ঞেস করেছিলি ও ডানপায়ের জুতাটা বাম পায়ের করল কিভাবে?’

করেছিলাম।

তখন কি বলল?

ও বলল, কিছু না ও নাকি শুধু আমার ডান পায়ের জুতোটা নিয়ে মহাশূন্যে একটা চক্কর দিয়ে এসেছে। ওর রকেটে করে...

- এ্যালিয়েন...!! ছোট মামা প্রায় চৈঁচিয়ে ওঠেন। 'দুলাভাই বুঝতে পারছেন কিছু? ডান পায়ের জুতো কখন আপনি আপনি বাম পায়ের হয়ে যায়...? আমাদের পল্টুর সঙ্গে এ্যালিয়েনদের কথা হয়েছে...!'

এরপর বেশ কয়েকদিন ছোট মামা ক্যামেরা রেকর্ডার নিয়ে বাড়ির পিছনের ঝোপের আশে পাশে ঘাপটি মেরে থেকেছেন অনেকদিন। কিন্তু ঐ জুতো বদলের ঘটনার পর পল্টুর বন্ধুকে আর আসতে দেখেনি কেউ। পল্টুও না। তবে পল্টুর বিশ্বাস তার ভিনগ্রহের বন্ধু আবার কোনো একদিন ফিরে আসবে, আসবেই...।



গুচ্ছ অন্ধ

ডক্টর আমার মা কেমন আছেন?

ভালো!

কোন উন্নতি?

দেখুন এটা খুব জটিল একটা রোগ।

রোগটার নাম কি?

ক্লাসটার রাইন্ড

মানে কি?

মানে বাংলা করলে হয় গুচ্ছ অন্ধ...

বুঝলাম না ।

আসলে... বিশেষজ্ঞ ডক্টর একটু থামেন । তারপর ফের বলেন...  
'আপনার গত দুই হাজার এগার বারের সময়কার বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার  
কথা মনে আছে ?'

আছে...

সেই বিশ্ব মন্দার পরপরই পৃথিবীতে কিন্তু ব্যাপক মুদ্রাস্ফিতি ঘটে তখন  
মানুষের হাতে প্রচুর অর্থ চলে আসে । ঠিক তখনই এই রোগটার প্রাদুর্ভাব  
ঘটে ।

ক্লাসটার রাইন্ড?

হ্যাঁ... কিছু কিছু মানুষ তখন... বিশেষ করে মহিলারা প্রচুর কেনাকাটা  
করতে শুরু করল । তখন বাজারে নতুন নতুন সব আইটেম এসেছে ।  
চমকপ্রদ সব হাইটেক বিনোদন সামগ্রী... আর অন্যান্য জিনিসপত্র তো  
আছেই ...

বিষয়টা এমন হল যে কিছু কিছু মানুষ—যেমন বদরুল সাহেবের মায়ের  
কথাই ধরা যাক । প্রায় প্রতিদিন মার্কেটে যেতেন । কিছু না কিছু  
কিনতেনই । ঘর ভরে গেল জিনিসে । এক পর্যায়ে এমন হল তার নিজের  
ঘরে থাকার জায়গা নেই । বিছানায় জিনিস সোফায় জিনিস... ওয়ার্ডড্রবে  
জিনিস জিনিস জিনিস আর জিনিস... এক পর্যায়ে তিনি হোটেলের একটা  
রুমে গিয়ে উঠলেন । ঘরে জায়গা নেই কি করবেন? সেই হোটেলের রুমও  
ভরে উঠতে শুরু করল । তখন টনক নড়ল বদরুল সাহেবের । ছুটলেন  
বিশেষজ্ঞ ডক্টরের কাছে ডক্টর শমসের মুস্তাফিজ ।

তাহলে ডক্টর শমসের আপনি বলতে চাচ্ছেন আমার মা ক্লাসটার রাইন্ড  
রোগে আক্রান্ত?

জি ।

এটা থেকে মুক্তির উপায় কি?

উপায়ের কথা আমরা পরে ভাববো... আগে আপনাকে রোগটা বুঝতে হবে ।

এটা তো একটা মানসিক রোগ তাই নয় কি?

হ্যাঁ অবশ্যই । আপনার মা আসলে আপনার বাবার মৃত্যুর পর সঙ্গিহীন হয়ে পড়েন । তখন শপিং করার মধ্যে হয়ত এক ধরনের বিনোদন খুঁজে পান তিনি ।

তাই হবে ।

তারপর জিনিস কিনতে থাকেন তিনি প্রতিদিন... প্রতিদিন...তাই না?  
জি তাই...

জিনিসে ঘর-বাড়ি ভরে উঠতে থাকে । তিনি ঘরে জায়গা নেই বলে হোটেল গিয়ে ওঠেন । আপনিই ব্যবস্থা করে দেন ।

জি অর্থাৎ তাই ।

তারপর হোটেলও জিনিস-পত্রে ভরে উঠতে থাকে ।

জি ।

আসলে আপনার মা... শুধু আপনার মা কেন আমরা সবাই থ্রিডি জগতে বাস করি । দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর উচ্চতার এক জগতে (সেখানে সময়ও আছে) । তিনি তার ঘরে গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে পড়ে থাকা থ্রিডি জিনিসগুলোকে তিনি ঠিক ফিল করেন না... "যেন দেখতেই পান না... এ জন্যই বলা হয়ে থাকে ক্লাসটার রাইন্ড । তার কাছে সব কিছু স্বাভাবিক মনে হয় তখন আমরা করলাম কি...

কি করলেন?

আমরা তার ঘরের কিছু ছবি তুললাম । ছবিগুলো সব টু ডি... সেই ছবিগুলো একটা এ্যালবামে সেটে তাকে দিলাম দেখতে । আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, নিজের ঘরে গুচ্ছ গুচ্ছ করে জিনিসপত্রে ঠাসা থ্রিডি সিচুয়েশন যখন তিনি টুডিতে দেখলেন তখন আঁতকে উঠলেন ।

মানে মা ভয় পেলেন?

হ্যাঁ...

তারপরই আইডিয়াটা আমার মাথায় এল ।

কোন আইডিয়া?

ঐ যে আপনার মায়ের সমস্ত ছবি নিলাম আপনার কাছ থেকে। সেই তার ছোটবেলা থেকে এই বেলা পর্যন্ত। সব ছবি। ঐ মোটা নতুন এ্যালবামটা, ওটায় সব ছবি সাটা হল।

তারপর?

তারপর আমি তার একটা মাত্রা তুলে নিলাম।

মানে?

মানে উচ্চতা মাত্রাটা আমি সরিয়ে ফেললাম... তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা মাত্রা তিনটা থেকে উচ্চতাটা সরিয়ে নিলাম (সময় কিন্তু আছে)।

তাতে কি হল?

আপনার মা টুডি জগতে চলে গেলেন।

মানে...?? এসব কি বলছেন???

এই যে নিন। ডক্টর শমসের মুস্তাফিজ মোটা এ্যালবামটা বদরুলের হাতে তুলে দেন। তারপর ব্যাস্তসমস্ত হয়ে বের হয়ে যান ডক্টর। আর বদরুল শূন্য কেবিনে ধপ করে বিছানাটায় বসে এ্যালবামের পাতাটা উল্টান। মায়ের প্রতিটা ছবি যেন জীবন্ত... বদরুলের মনে হল ছবিগুলোর মধ্যে মা যেন নড়েচড়ে উঠলেন। বদরুলের দেখার ভুলও হতে পারে। সে চট করে এ্যালবামটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। তার কেমন যেন অস্বস্থি লাগে।



## আফজাল সাহেবের দুই সংসার

মা?

হু।

বাবা মাঝে মাঝে কোথায় গায়েব হয়ে যায়?

গায়েব হয়ে যায়! এটা কেমন ধারা কথা? বড়দের সম্পর্কে সম্মান দিয়ে কথা বলবে কতবার বলেছি।

আচ্ছা সরিয়, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরটা তো দিলে না।

বাবা ব্যবসার কাজে যায়। কাপড় কিনে আনতে যায় কখনো টাঙ্গাইল কখনো রাজশাহী। কেন হটাৎ এ প্রশ্ন কেন?

না এমনি ।

রায়হান আবার নিজের কাজে মনোযোগ দেয় । কাজ মানে সে একটা মিনি ট্রিটেরিয়াম বানাচ্ছে । ট্রিটেরিয়াম নামটা অবশ্য তার নিজের দেয়া । এ্যাকুরিয়াম থেকে ট্রিটেরিয়াম মানে... তাদের একটা গোল কাচের এ্যাকুরিয়াম ছিল সেখানে একটা মাছ ছিল গোল্ড ফিশ । সেটা মরে যাওয়ার পর সেখানে সে ট্রিটেরিয়াম বানানোর চেষ্টা করছে মানে নিচে মাটি থাকবে তাতে থাকবে ছোট ছোট গাছ । পাথর... একটা মিনি জঙ্গল একটা ছোট গোল কাচের জারের ভিতর ।

মাটি কাদা দিয়ে এসব কি করছিস?

ট্রিটেরিয়াম বানাচ্ছি ।

দেখ মন্টু তুই এখন বড় হয়েছিস কলেজে ফাস্ট ইয়ারে পড়িস এখন এসব মাটি কাদা নিয়ে খেলাধুলা তোকে মানায় না ।

একদম ঠিক কথা । পাশ থেকে ছোট বোন এইটে পড়ুয়া পিয়া আওয়াজ দেয় ।

এটা মোটেই মাটি কাদা নিয়ে বাচ্চাদের খেলা নয় । এটা একটা রিসার্চ ওয়ার্ক বলতে পার ।

হয়েছে এসব সরাও তোমার বাবার আসার সময় হয়েছে, উনি দেখলে রাগ করবেন । ঘরবাড়ি নোংরা করে এ আবার কেমন গবেষণা ।

এইতো আমার কাজ শেষ হয়ে আসছে । আমি পরিস্কার করে দেব সব । বলে দ্রুত হাতা লাগায় মন্টু । ফার্ন গাছগুলো মাটিতে বসাতে থাকে টিপে টিপে ।

ট্রিটেরিয়াম বানাতে বানাতে চিন্তাটা আবার মাথায় আসে মন্টুর । চিন্তাটা তার বাবাকে নিয়ে । আনডাউটলি তার বাবা একজন গরীব মানুষ । ইসলামপুরে ছোট খুপরি একটা দোকানে কাটা কাপড়ের ব্যবসা করেন । মন্টু একবার দূর থেকে দোকানটা দেখেছে (বাবা কখনো তাদের ঐ দোকানে যেতে বলে না) দোকানটা দেখে চরম হতাশ হয়েছে সে । এই তাদের দোকান? এর থেকে তাদের সংসারের আয় আসে? অবশ্য সংসারে



সবসময় টানাটানি লেগেই আছে। মন্টু দুটো টিউশনি করে নিজের খরচটা ম্যানেজ করে কোনোকমে।

এ সময় কলিং বেল বেজে উঠল। বাবা এসেছেন। মন্টু দ্রুত তার জিনিসপত্র টেবিলের নিচে ঢুকিয়ে জায়গা পরিষ্কার করে ফেলল।

বাবা ঢুকলেন।

কইগো জলদি ভাত দাও।

এত জলদি কেন? আবার দোকানে যাবে?

না।

তাহলে এত তাড়া কিসের?

টাঙ্গাইল যেতে হবে।

এখন?

হ্যাঁ হটাৎ করে কিছু ভালো কাপড়ের সন্ধান পেয়েছি।

ঐ দিন না রাজশাহী থেকে এলে।

আহ্ এত কথার জবাব দিতে পারব না খাবার দিলে দাও আর ব্যাগটা ঘুছিয়ে দাও।

পাশের ঘর থেকে মন্টু বাবা-মার কথা শোনে। তখনই সে একটা সিদ্ধান্ত নেয়। তার বাবাকে সে ফলো করবে। বাবা সত্যি কোথায় যায়? সে এমন কোনো বড় ব্যবসায়ী না যে তাকে তিন-চারদিন টাঙ্গাইল থেকে কাপড় আনতে হবে। তার বন্ধু নাবিলের বাবার বিশাল কাপড়ের দোকান। দোতলা। উনিও মাঝে মাঝে টাঙ্গাইল যায় কাপড়ের সন্ধানে কিন্তু দিনে গিয়ে দিনে চলে আসে, নাবিলের কাছে শুনেছে। তাহলে তার বাবার মতো ছোটখাট খুপরি দোকানের ব্যবসায়ে কেন তিনদিন চারদিন টাঙ্গাইল থাকতে হবে?

সে তার সাইকেলটা নিয়ে বের হয়। মা বাবাকে ভাত দিচ্ছিলেন। চৌঁচিয়ে বললেন, ‘এখন আবার কোথায় চললি?’

এই একটু, চলে আসব এখনি।

সে সাইকেল নিয়ে বের হয়। মোড়ের দোকানটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবাকে এ পথ দিয়েই যেতে হবে। নিজের বাবাকে সন্দেহ করা খুব বাজে ব্যাপার, তারপরও বিশেষ একটা কারণে তার মাথায় একটা বাজে চিন্তা এসেছে। সেটা তার বোঝা দরকার।

এ সময় বাবাকে দেখা গেল রিক্সা নিয়ে বের হলেন গলি থেকে। বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে একটা বাসে চড়লেন। অবশ্যই টাঙ্গাইলের বাস না। গুলশানের বাস। মন্টুর একটু সমস্যা হল। দ্রুতগামী গুলশানের বাসটাকে ফলো করতে। তারপরও সে প্রচণ্ড গতিতে সাইকেলে অনুসরণ করল বাসটাকে। মাঝে মাঝে জ্যামে পড়ায় তবু রক্ষা।

গুলশানের একটা স্টপেজে বাবা নেমে গেলেন। এই এলাকায় কখনো আসে নি মন্টু। বাবা এখানে কেন? এলাকাটা খুব নিরিবিলা। বিরাট বিরাট সব আধুনিক বাড়ি। বড়লোকদের এলাকা বোঝাই যাচ্ছে। বাবা এবার হেঁটে রওনা দিলেন। খুব সাবধানে অনুসরণ করল মন্টু। বাবা যে টাঙ্গাইল যাচ্ছেন না এটা পরিস্কার। বাবা একটা আধুনিক বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। মন্টু আশ্চর্য হয়ে দেখল। ঐ বাড়ির দারোয়ান কিসিমের একটা লোক ছুটে এসে বাবাকে সালাম দিয়ে বাবার ব্যাগটা নিয়ে গেট খুলে দিল। গেট খোলায় দেখা গেল দুটো গাড়ি ভিতরে! ...এটা কার বাড়ি?

মা?

উ।

বাবা মাঝে মাঝে কোথায় গায়েব হয়ে যায় বলতো?

গায়েব হয়ে যায় এটা কেমন ধরনের কথা? বড়দের সম্পর্কে সন্ধান দিয়ে কথা বলবে কতবার বলেছি।

আচ্ছা সরিয়, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরটা তো দিলে না।

বাবা ব্যবসার কাজে যায় এ আর নতুন কি। গত সপ্তাহে থাইল্যান্ডে কনফারেন্স ছিল। কেন, হটাৎ এ প্রশ্ন কেন? তুই কি ভুলে যাস তোর বাবা দেশের একজন নামকরা শিল্পপতি?

না, সেটা মনে থাকে তারপরও...

মন্টু আবার নিজের কাজে মনোযোগ দেয় । কাজ মানে সে একটা  
এ্যানিমেশন ক্যারেঙ্টার তৈরি করার চেষ্টা করছে ।

তখন থেকে কম্পিউটার নিয়ে বসে আছিস?

একটা এ্যানিমেশন ক্যারেঙ্টার বানাচ্ছি... গেমসের চরিত্র...

দেখ মন্টু তুই এখন বড় হয়েছিস ও লেভেল শেষ করেছিস এখন এসব  
কম্পিউটার গেমস নিয়ে খেলাধুলা তোকে মানায় না ।

একদম ঠিক কথা । পাশ থেকে ছোট বোন পিয়া না বুঝেই আওয়াজ  
দেয় ।

উফ ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পারনি । আমি গেমস খেলছি না একটা  
গেমসের ক্যারেঙ্টার বিল্ডআপ করছি । একটা ইন্টারন্যাশনাল বিখ্যাত গেম  
ক্যারেঙ্টার ।

হয়েছে এবার কম্পিউটার বন্ধ করে গায়ে হাওয়া বাতাস লাগাও ।  
তোমার বাবা এসে কম্পিউটারের সামনে বসে থাকতে দেখলে রাগ  
করবেন । জিমে যাও না কেন?

এইতো আমার কাজ শেষ হয়েছে প্রায়, রেন্ডারিংয়ে দিয়েই উঠছি...

আজ সকাল থেকেই চিন্তাটা মাথায় আসে মন্টুর । চিন্তাটা তার বাবাকে  
নিয়ে । আনডাউটলি তার বাবা একজন ধনী মানুষ । সারা দেশে কম করে  
হলেও চারটা ইন্ডাস্ট্রি তার । টাকা-পয়সার কোনো সমস্যা তাদের নেই,  
কখনই ছিল না । কিন্তু সন্দেহ অন্য জায়গায় । বাবা হঠাৎ হঠাৎ বিদেশ  
যায় । সেরকমই বলা যায় । যাওয়াই স্বাভাবিক । তারপরও তার মাথায়  
একটা কিন্তু ঢুকিয়ে দিয়েছে তারই এক বন্ধু সালেক । বড় লোকরা...

এ সময় কলিং বেল বেজে উঠল । বাবা এসেছেন । মন্টু দ্রুত তার  
প্রোগ্রামটা রেন্ডারিংয়ে দিয়ে মিনিমাইজ করে উঠে পড়ে ।

বাবা ঢুকলেন ।

কইগো জলদি ভাত দিতে বল ।

এত জলদি কেন? আবার কোন অফিসে যাবে?

অফিসে না ।

তাহলে এত তাড়া কিসের?

মালয়েশিয়ায় যেতে হবে ।

এখন?

হ্যাঁ দুপুরে ফ্লাইট ।

ঐ দিন না মালয়েশিয়া থেকে এলে ।

আহ এত কথার জবাব দিতে পারব না খাবার দিলে দাও আর ব্যাগটা গুছিয়ে দাও ।

সালমা, খানা লাগাও জলদি । চেষ্টা করে ওঠেন মনু'র মা । সালমা আর সঙ্গের আরো দুটি মেয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয় ।

পাশের ঘর থেকে মনু বাবা-মার কথা শোনে । তখনই সে একটা সিদ্ধান্ত নেয় । তার বাবাকে সে আজ ফলো করবে । বাবা সত্যি কোথায় যায়? সত্যিই কি মালয়েশিয়ায় যাচ্ছে । তার একটা সন্দেহ হচ্ছে, অমূলক সন্দেহও হতে পারে ।

সে তার বাইকের হেলমেটটা নিয়ে বের হতে যাচ্ছে, মা বাবার টেবিলে বসেছিলেন । চেষ্টা করে বললেন,

এখন আবার কোথায় চললি?

এই একটু, চলে আসব এখনি ।

তাকে না বললাম বাইক চালাবি না? তোর গাড়ি কি হয়েছে?

এই কাছেই একটু যাব তাই...

মনু তার মোটরবাইকটা নিয়ে বের হয়ে পড়ে । তার নিজের ছোট্ট বুইক গাড়িটা নিয়ে বের হলেও হত । কিন্তু ফলো করলে বাবা চিনে ফেলতে পারে ।

মনু বাইক নিয়ে মোড়ের দোকানটার পাশের বড় রেইনট্রি গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে । বাবাকে এ পথ দিয়েই যেতে হবে । নিজের বাবাকে সন্দেহ করা খুব বাজে ব্যাপার, তারপরও বিশেষ একটা কারণে তার মাথায় একটা বাজে চিন্তা এসেছে । সেটা তার বোঝা দরকার ।

এ সময় বাবাকে দেখা গেল কালো পাজেরোট্টা নিয়ে বের হলেন । তিনি  
যেদিকে চললেন সেটা এয়ার পোর্টের রাস্তা নয় । বাবা অন্যদিকে যাচ্ছেন ।

মন্টু খুব সাবধানে ফলো করতে লাগল দূরত্ব রেখে ।

গাড়ীটা একটা ঘুপচি গলিতে এসে থামল । ভীষণ অবাক হল মন্টু ।  
তার প্রচণ্ড ধনী বাবা কি সত্যিই... বাজে চিত্তাটা তার মাথায় আসে । বাবা  
নেমে ড্রাইভারকে কি বললেন । ড্রাইভার গাড়ি ব্যাকে নিয়ে চলে গেল ।  
বাবা একা দাঁড়িয়ে আছেন । একি বাবার একি পোশাক! মন্টু অবাক হয়ে  
দেখল খুব সাধাসিধে একটা ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে । হাতে রং ওঠা একটা  
ট্রাভেল ব্যাগ । এর মানে কি? তার স্মার্ট বাবা...

বাবা হাঁটছেন । মন্টু বাইকটা একটা মুদির দোকানের সামনে স্ট্যান্ডে  
দাঁড় করিয়ে দ্রুত হাতে লক করল । হেঁটে হেঁটেই বাবাকে অনুসরণ করল ।  
গলিটায় প্রচুর মানুষ । গরীব এলাকা বোঝাই যাচ্ছে । বাবা একটা বাড়ির  
সামনে এসে দরজায় নক করল ।

দরজা কে খুললো বোঝা গেল না । দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল  
একটা সাইকেলের চাকা ভিতরে! ...এটা কার বাড়ি?

‘মা তোমার সাথে একটা জরুরি কথা আছে ।’

কি কথা?

তুমি তোমার মনটাকে একটু শক্ত কর ।

মানে? ভয় পেয়ে যায় মা ।

হ্যাঁ খুব বাজে একটা কথা বলব । বাবা সম্পর্কে ।

মানে?? কি বলছিস এসব?

এখনো বলি নি... কিন্তু বলতে হবে ।

বল... জলদি বল, কি হয়েছে তোর বাবার?

বাবার আরেকটা... মন্টু থামে । বলতে দ্বিধা লাগে একটু ।

আরেকটা...? আরেকটা কি??

বাবার আরেকটা সংসার আছে ।

কি বলছিস?? আতর্জনাদ করে ওঠেন মা!

হ্যাঁ... আমি ভালো মতোই খোঁজ-খবর নিয়েছি। মাঝে-মাঝেই বাবা চলে যায়... দু-তিন দিনের জন্য... আসলে যায় তার দ্বিতীয় সংসারে। সেখানেও তার আমার মতো একটা ছেলে আর একটা মেয়ে আছে।

তাদের দেখেছিস ?

না, তবে জেনেছি আমাদের বয়সীই।

মার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। তিনি উঠে দাঁড়ান। ‘তোর কাছে ঐ বাড়ির ঠিকানা আছে?’

আছে।

দে।

তুমি যাবে?

অবশ্যই যাব... এক্ষুণি যাব...

কি লাভ গিয়ে?

লাভ-ক্ষতি আমি বুঝবো... তুই ঠিকানাটা দে...

দুজন মা কিংবা দুজন স্ত্রী ছুটে চলেছেন... একজন আরেকজনের দিকে। তারা যতই কাছাকাছি আসছিলেন আমরা ততই অস্বস্তিতে পড়ছিলাম। আমরা মানে আমরাই... প্যারালাল হিউমেন বডি। আমরা একই মস্তিষ্কের পাশাপাশি দুজন মানুষ। প্রকৃতির একটা জটিল অংশ। আমরা চাইলে কথা বলতে পারি... আমাদের কথাবার্তা শোনাতে আলোচনার মতো যেন মানুষের টিভিতে কোনো টক শো হচ্ছে।

প্যারালাল ইউনিভার্সকে আমরা অলটারনেটিভ রিয়েলিটি বলতে পারি কিনা?

পারি।

আর যদি কোয়ান্টাম ম্যাকানিকস দিয়ে ব্যাখ্যা করি?

একটা কোয়ান্টাম ইভেন্ট দুটো পৃথিবীকে আলাদা করেছে এভাবে বলা যায় হয়তো।

আমার মনে হয় আমরা শুরু থেকেই আসি না কেন?

দরকার কি? বিষয়টা প্যারালাল ওয়ার্ল্ডের সমস্যা।

সমস্যা বলছ কেন? এটাইতো স্বাভাবিক ।

একটা পৃথিবীর ভিতর আরেকটা পৃথিবী ঢুকে আছে । কিন্তু একটি পৃথিবীর একই চরিত্র আরেকটি পৃথিবীর একই চরিত্রের দিকে ছুটে যাচ্ছে ।

তাদের দেখা হবে না... সম্ভব না ।

যদি সম্ভব হয়?

কিভাবে?

তুমি কি জান, ১৯৬৬ সালে পেরুভিয়ান পর্বতের পাদদেশের এক ছোট্ট শহরে এক প্রাচীন পাথুরে মানুষ আর ডাইনোসরের ছবি পাওয়া গেছে, এক সঙ্গে একই পাথরে!

তাতে সমস্যা কি?

সমস্যা বুঝতে পারছ না?

না ।

৬৭ মিলিয়ন বছর আগে ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়েছে আর মানুষ ছিল মাত্র এক মিলিয়ন বছর আগে । কিন্তু দুজন... মানে মানুষ আর ডাইনোসর একই পাথরের ছবিতে আসে কি করে?

সেরকমটাই ঘটতে যাচ্ছে?

হ্যাঁ... তখন মানুষ আর ডাইনোসরের দেখা হয়েছিল । আর এখন মানুষে মানুষে... দুজন নারী...

প্রবল অস্বস্তি নিয়ে আমরা অপেক্ষা করি... । ওদের ছুটে আসার দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছিল...!



প্রজেক্ট ব্রেন এ্যাকোয়ার

দারুণ আইডিয়া তো!

হু।

কোথায় পেলি আইডিয়াটা ?

একটা বিদেশি গল্পে। সেখানে কয়েক বন্ধু মিলে ঘটনাটা ঘটায়।

আমরাও তো কয়েক বন্ধু।

আমরা বন্ধু না, আমরা শত্রু। একটা জায়গায় আমাদের মিলেছে বলে কাজটা করতে যাচ্ছি।

আমরা শত্রু হতে যাব কেন?



এই যুগে বন্ধু বলে কিছু নেই। সবাই শত্রু... আমি তাই বিশ্বাস করি।  
তোর বিশ্বাস নিয়ে তুই থাক... এখন বিষয়টা আরেকবার ব্যাখ্যা কর।  
আসলে ঐ গল্পে একটাই বন্ধু অন্যরা তাকে হেলে করে।

আরেকটু ক্লিয়ার করে বল?

মানে তারা যেটা করে একটা মিথ্যে স্মৃতি ওর মাথায় ঢুকিয়ে দেয়।  
সেটা কিভাবে?

ওফ একবার তো বললাম।

আরেকবার বল না... প্লিজ।

ধর আমি তোকে চিনি। আমি তোকে বললাম, ‘বজলু মনে আছে গত বছর আমরা কক্সবাজারে কত মজা করেছিলাম?’ আসলে কিন্তু তোকে নিয়ে আমরা কক্সবাজার যাই নি। কিন্তু তুই প্রতিবাদ করলি, ‘না গত বছর তো আমি কক্সবাজার যাইনি।’

আরে আশ্চর্য ভুলে গেছিস? ছবি দেখালে বিশ্বাস করবি? তোকে ছবি দেখালাম।

ছবি কোথায় পেলি?

আরে বাবা ছবি ফটোশপে বানানো কোনো ব্যাপার আজকাল?  
...তারপর ধর তুই কনফিউজ হয়ে আরো দু’এক ফ্রেমকে ফোন দিলি,  
তারাও বলল।

‘হ্যাঁ তোকে নিয়ে গেলাম না আমরা? ভুলে গেছিস?’ তারপর তুই কনফিউজ হয়ে গেলি। ধরে নিলি তোর মস্তিস্কে স্মৃতি ভ্রংস হয়েছে। গেলি কোনো নিউরোলজিস্টের কাছে। সে বলল (তাকেও আগে থেকে ফিট করা আছে)।

এটা হতে পারে মস্তিস্কের একটা দুটো স্মৃতি হারিয়ে যেতে পারে। এটা হচ্ছে ব্রেনের এক ধরনের ডিফেকশন...

ডিফেকশন... কি?

উফ ডিফেকশন কি আমি জানি? বানিয়ে একটা শব্দ বললাম আরকি।  
তারপর কি হবে?

তারপর সে... মানে তুই কিংবা আমরা যাকে এটা করব, সে বিশ্বাস করবে যে, সে সত্যিই আমাদের সঙ্গে কক্সবাজার গিয়েছিল। মিথ্যে ঘটনাটা তার মাথায় এসে একটা হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি হিসেবে সেট করে নেবে।

ওহ দারুণ আইডিয়া! ...সুপার!!

তখন থেকে দারুণ আইডিয়া আইডিয়া করছিস। কাজটা কিন্তু জটিল এবং সময় সাপেক্ষ। পুরো একটা স্ক্রিপ্ট বানাতে হবে আমাদের।

স্ক্রিপ্ট কেন?

বাহ্ আমরা একটা মানুষের ব্রেনের অন্য সব স্মৃতি মুছে ফেলে আমাদের তৈরি করা ঘটনা ঢুকিয়ে দেব বলে বলে... কি কি ঘটনা ঢুকাবে সেগুলো সিরিয়াল করতে হবে না?

স্মৃতি মুছবো কিভাবে?

আসলে স্মৃতি মুছতে পারব না। তবে যে স্মৃতিগুলো সে বিশ্বাস করে, এক এক করে নিজের মাথায় ঢুকাবে, মানে বিশ্বাস করতে থাকবে সেগুলোর ভারে যদি আসল স্মৃতিগুলো চাপা পড়ে

হুম... তার মানে আমাদের মিথ্যা ঘটনার স্মৃতিগুলো ঢুকিয়ে ওর স্মৃতিগুলো চাপা দিতে হবে... একধরনের

ডিফ্রেকশন...?

তুই কি আমার সাথে ইয়ার্কী করছিস?

আরে না না দোস চল তাহলে আজ থেকেই কাজে নেমে যাই...

আজ না কাল থেকে...

আচ্ছা এমন হয় না?

কি?

আমরা মানুষের স্মৃতি না ঢুকিয়ে যদি অন্য কিছু ঢুকাই।

মানে?

মানে ধর কোনো এ্যালিয়েন?

কি যে সব গাধার মতো কথা বলিস না! এ্যালিয়েনের স্মৃতি তুই কোথায় পাবি?

বাহ আমি তো গেম তৈরি করি। একটা বিদেশি কোম্পানিকে ভিডিও গেমসের স্ক্রিপ্ট পাঠাই। ওরা নুতন একটা স্টোরির আউট লাইন পাঠিয়েছে এ্যালিয়েনের।

না না আমরা এসব ঢুকাব না। আমরা জানি সে ভয়ঙ্কর একটা খারাপ মানুষ। তার ব্রেনের ভিতর আমরা একটা ভালো মানুষের স্মৃতি ঢুকাব সিরিয়ালি ওয়ান বাই ওয়ান...

ফকরুল আমিনের মাথায় এখন দুটো স্মৃতি। একটা তার নিজের। ছোটবেলা থেকে বিন্দু বিন্দু করে মাথার নিউরনে জমা হওয়া... আরেকটা... সে সম্প্রতি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে... স্মৃতিগুলো সুন্দর। ভালো তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় ইনফ্যান্ট সে বিশ্বাস করে বসে আছে। যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে...

...৭৮ সালের দিকে সে একটা খুন করেছিল। নিজের হাতে। পরে যখন খুন হওয়া লোকটার বউটাকে কাঁদতে দেখল টিভির খবরে, তখন তার একটু খারাপ লেগেছিল। খুব অল্প কিছুক্ষণের জন্য যদিও। কিন্তু এখন যখন সে নতুন স্মৃতিটাতে জানতে পারল খুনটা সে নিজে করে নি তখন কেন জানি না এই এত বছর পর তার কোনো কারণ ছাড়াই ভালো লাগছে...

সে অবশ্য একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সাথেও একাধিকবার সিটিং দিয়েছে। লোকটা ভালো।

তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনার মাথায় এই মুহূর্তে দুটো প্যারালাল স্মৃতি?

জি, একটা ভালো একটা খারাপ।

আপনি ভালোটা বিশ্বাস করতে চাচ্ছেন?

জি।

তাই করুন।

সে ক্ষেত্রে খারাপটা...

খারাপটাকে এ্যাভোয়েড করুন।

এতে কি মস্তিষ্কে কোনো চাপ?

মস্তিষ্ক কখনই নিজ থেকে বাড়তি চাপ নেয় না। নেবে না। আপনি ভালো স্মৃতিগুলো বিশ্বাস করে নতুন জীবন শুরু করুন...

পারব?

কেন নয়?

সত্যি বলছেন?

অবশ্যই।

অনেক ধন্যবাদ।

ফখরুল আমিন চলে যেতেই। সাইকিয়াট্রিস্ট ফোন দিল একটা নির্দিষ্ট নাম্বারে।

হ্যালো?

বল, ফখরুল আমিন এসেছিল?

হু... আমাদের প্রজেক্ট সাকসেসফুল।

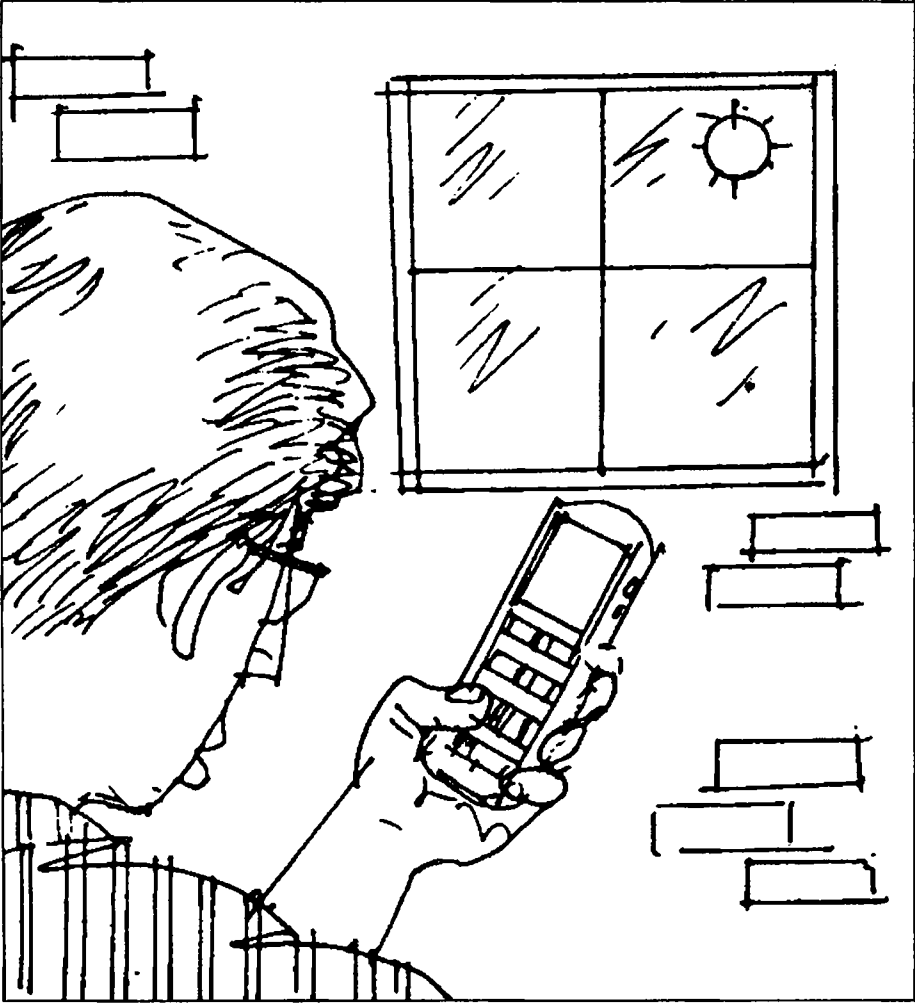
ও তাহলে এখন ভালো মানুষ?

হ্যাঁ... তাই মনে হচ্ছে।

ভেরি গুড। তাহলে সেকেন্ড স্ক্রিপ্টটা তৈরি করি কি বল?

কর।

ওপাশে অস্পষ্ট একটা হাসির শব্দ পাওয়া গেল। সাইকিয়াট্রিস্টের মুখেও মৃদু হাসি ফুটলো। হাসি একটি সংক্রামক প্রক্রিয়া।



## তানিমের দুই সীম

তানিমের মোবাইল সেটটা হাইজ্যাক হওয়ায় এক দিকে ভালোই হল। সেটটা পুরানো হয়ে গিয়েছিল। নতুন একটা সেটও কিনব কিনব করছিল। কিন্তু একটা যেহেতু আছে, কাজও চলছে তাই নতুন একটা সেট কেনা হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত সেটটা হাইজ্যাক হল। হাইজ্যাকের একটা অভিজ্ঞতাও হল তার।

আবাহনী মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। হটাৎ একটা ছেলে বলল, এই জহির কি খবর?

আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ... তুমি জহির না?

না ভুল করছেন। এই সময় তানিম টের পেল তার পিছনে আরো দুজন এসে দাঁড়িয়েছে। এবং তখন সে ব্যাপারটা বুঝতে পারল যে সে আসলে হাইজ্যাকারের পাল্লায় পড়েছে।

ওরা অবশ্য দেরি করল না পেছনের ছেলে দুটো তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে টপ করে মানিব্যাগটা আর মোবাইলটা বের করে নিয়ে পিঠে একটা ধাক্কা দিল। মানে যাও। আর সামনের ছেলেটা সরে গেল।

হাইজ্যাক ব্যাপারটা যতটা অর্থনৈতিক ক্ষতি তার চেয়ে বেশি মানসিক। নিজেকে খুব ছোট লাগে। মুহূর্তে একধরনের বাজে হীনমন্যতা গ্রাস করল তানিমকে। রাষ্ট্রের উচিত ছিল তার নাগরিকদের এ ধরনের হীনমন্যতা থেকে মুক্ত করার। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যর্থ। নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ। অবশ্য অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তানিম সামলে উঠল।

তারপরই সে একটা মোবাইল সেট কিনল। ডাবল সীম। মানে এক সঙ্গে দুটো সীম ভরা যাবে। মন্দ কি? সে একটা নতুন সীমও কিনে ফেলল। এখন তার দুটো নাম্বার। তার বন্ধু-বান্ধবের একাধিক মোবাইল তার মাত্র একটা। তবে সীম দুটো নাম্বারও দুটো।

ভালোই চলছিল কিন্তু একদিন কি পাগলামী চাপল, সে তার একটা সীমের নাম্বার থেকে আরেকটা নাম্বারে ফোন করল। দেখি না কি হয়। কিছু হল না নাম্বারটা গেল না, যাওয়ার কথাও না... কারণ সীম দুটা হলেও সেট কিন্তু একটা, সেটা তানিম ভালো করেই জানে।

তবুও মাঝে মাঝেই এই পাগলামোটা করত তানিম কোনো অলস মুহূর্তে। হয়ত ভার্টিসি বন্ধ ক্লাশ নেই নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে... নিজেকেই নিজে ফোন করা। বিশেষ করে যেদিন তন্মিকে ফোনে পেত না, সেদিন এই কাজটা করত। আর তন্মির ব্যাপারটাও সে বুঝে না যেদিন জরুরি কাজ থাকে, সেদিন সে ফোন ধরে না। যেমন আজ তার জানা দরকার ছিল কাল তন্মি তার সাথে বসুন্ধরার ফুটকোর্টে কখন যাবে সেটা কনফার্ম করা। কিন্তু সে ফোন ধরছে না। কোনো মানে হয়? তানিম যথারীতি নিজেকেই নিজে ফোন করল...

...টুউউউট... টুউউউট... টুউউউট...

একি রিং হচ্ছে! অবাক হয় তানিম। আর ঠিক তখনই অন্যপাশ থেকে কেউ ফোনটা ধরল। চট করে তানিম ফোনের চওড়া স্ক্রিনে দেখে নিল সে ঠিক তার নাম্বারেই ফোন করেছে কিনা। হ্যাঁ নাম্বার ঠিক আছে তারই আরেকটা নাম্বার যার সীমটা এই মোবাইলের ভিতরই আছে।

হ্যালো?

ওপাশ থেকে কেউ বলল।

হ্যালো... এপাশ থেকে তানিম বলল।

কাকে চাচ্ছেন? ওপাশ থেকে বলল কেউ।

আপনি কে? তানিম বলল এপাশ থেকে।

আমি তানিম। ওপাশ থেকে বলল।

ঠিক তখনই তানিম টের পেল ওপাশে তারই গলা। ‘আ-আপনি তানিম?’

হ্যাঁ ?

আপনি কে?

আ-আমিও তানিম।

মানে?

মানে আবার কি আমি তানিম বলছি। আপনিও তানিম? এটা আপনার নাম্বার?

হ্যাঁ।

কি করে সম্ভব, এটাতো আমার নাম্বার। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ। এপাশের তানিমের কেমন যেন ভয় হল। সে টপ করে কেটে দিল ফোনটা। আর তখনই তব্বির ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো ফোন করেছিলে?

হ্যাঁ কাজের সময় ফোন ধরো না কেন?

এই তো ধরেছি।

যখন ধরার তখন ধর না কেন?

মানে?

মানে যখনই তোমাকে ফোন করি ফোন বিজি । এত কথা কার সাথে বল?

আমার বয় ফ্রেন্ডের সাথে হয়েছে? ঝপ করে ওপাশে ফোন রেখে দিল তম্বি । রেগেছে ।

ফোন হাতে বসে আছে তানিম । তখনই আবার ফোন এল । সে ভাবল নিশ্চয়ই তম্বি স্যরি বলতে ফোন করেছে । না, তার একটা নাম্বার থেকেই তার কাছে ফোন এসেছে ।

হ্যালো?

কে ?

আমি তানিম ।

আমিও তানিম ।

আমরা দুজন কি একই লোক?

তাই মনে হচ্ছে ।

কিছু...

দুজনই চুপ করে থাকে । ফোনের মাঝে বুদবুদের মতো কেমন শব্দ হয় । সাথে একটা হালকা টানা সাইরেনের মতো শব্দ ।

হ্যালো?

হ্যালো... এটা কি করে সম্ভব আমি আমার সাথে কথা বলছি?

আমি জানি না । ওপাশ থেকে বলে ।

আমার মনে হয় ফোন রেখে দিই ।

দাও...

আর কখনো নিজেকে নিজে ফোন করব না ।

আমিও না ।

ঠিক আছে খোদা হাফেজ ।

খোদা হাফেজ ।

ফোন বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল তানিম । এর মানে কি? কি মনে করে ফোন খুলে নতুন সীমটা বের করে । ভালো করে দেখে সীমটার কোনায় ছোট্ট করে ইংরেজিতে লেখা... 'ডোন্ট ইউজ, অলটারনেটিভ



রিয়েলিটি সীম’ আর তখনই কলিং বেলটা বেজে উঠল । বাইরে গিয়ে দেখে  
একটা লোক ।

কাকে চান?

কিছু দিন আগে আপনি একটা ডাবল সীমের মোবাইল আর সীম  
কিনেছিলেন না?

হ্যাঁ ।

আপনার সীমটায় একটু সমস্যা আছে... তাই আসছি । এই যে একটা  
ঠিক সীম নিয়া আসছি । লোকটা একটা ছোট্ট সাদা খাম এগিয়ে দেয় ।  
খামটা খুলে দেখে আরেকটা সীম ।

দেন আগের সীমটা খুলে দেন ।

তানিমের হাতে সীমটা আগেই ছিল । সে সেটা এগিয়ে দেয় । বলে,  
আপনি আমার বাসার ঠিকানা জানলেন কিভাবে?

কেন ক্যাশমেমোতে ঠিকানা আছে ।

না ক্যাশমেমোতে আমি ঠিকানা লিখি নাই ।

লোকটা আগের সীমটা পকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে হাসে । তার কথার  
উত্তর না দিয়ে বলে, ‘ভাই যাই... কষ্ট দিলাম আপনেনে!’ তারপর আর  
দেরি করে না । দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় ।



## জঙ্গলের মানুষেরা

গভীর জঙ্গল। কোথাও কোথাও কিছু গাছের ছাল-বাকল পরা মানব-মানবীকে ঘুরে রেড়াতে দেখা যায়। শিশুরাও আছে। আছে হিংস্র প্রাণীরাও, মানুষ ও প্রাণীর সহাবস্থান। কোনো নিয়ম নেই জঙ্গলের। চারিদিকে সবুজ... গাছের ফাঁক দিয়ে ঝকঝকে রোদের আলোর ঝলকানী দেখা যায় মাঝে মধ্যে। মাঝে মধ্যে আকাশ কালো করে ঝড় ওঠে... উথাল পাতাল বাতাস এলোমেলো করে দেয় জঙ্গলকে... মানব মানবীরা ছুটে গিয়ে কোনো গাছের নিচে আশ্রয় নেয়। না তাদের কোনো বাড়ি-ঘর নেই। তারা

ইচ্ছে করলেই তৈরি করতে পারে ঘরবাড়ি... নিরাপদে থাকার জন্য কিন্তু করে না। নিয়ম নেই। এই জঙ্গলের নিয়মই হচ্ছে কোনো নিয়ম থাকবে না জঙ্গলে।

তারপরও হঠাৎ হঠাৎ একটা মাত্র নিয়ম মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যেমন আজ উঠেছে। ধরে আনা হয়েছে এক তরুণকে। যারা ধরে এনেছে তারাও তরুণ। কিংবা তার থেকে কিছুটা বয়স্ক। মেয়েদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, শিশুদেরও। জঙ্গলের অঘোষিত দলপতি বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। আর সবার মতো তিনিও গাছের ছাল-বাকল পরে আছেন। তিনি ইশারা করলেন, যার অর্থ ‘এখানে নয় ওকে ঐ পাহাড়ের ধারে নিয়ে চল।’ অন্যরা বুঝলো বিষয়টা। ঐ পাহাড় থেকে নিচে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে তাকে।

তারা দলবেঁধে এসে দাঁড়াল পাহাড়ের খাড়া ধারটার কাছে। সেই তরুণকে দুজন ধরে রেখেছে। এবার বৃদ্ধ মুখ খুললেন-

তুমি জঙ্গলের নিয়ম ভেঙেছ।

আমরা তো জানি জঙ্গলের কোনো নিয়ম নেই।

একটা নিয়ম আছে... মাত্র একটা সেটাই তুমি ভেঙেছ।

অঘোষিত বৃদ্ধ দলপতি সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন-

নিয়মটা কি তোমরা জানো তো?

জানি। সবাই চোঁচিয়ে জানাল।

তুমি বল নিয়মটা...

বৃদ্ধ একজন তরুণের দিকে আঙুল তুললেন।

তরুণ জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে মেশিনের মতো বলতে শুরু করল-

‘আমরা এই জঙ্গলের সব মানব-মানবীরা-শিশুরা... কখনো ফেলে আসা আধুনিক পৃথিবীর কিছু স্পর্শ করব না। কারণ আধুনিক পৃথিবীর সভ্যতা ছিল মানব বিধবংশী এক ভয়ঙ্কর সভ্যতা... যে কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে নিজে নিজেই ...আমরা যারা বেঁচে আছি...’

বৃদ্ধ দলপতি হাত তুলে তাকে থামালেন।

জঙ্গলের একমাত্র আইন সম্পর্কে বল।

আর হ্যাঁ জঙ্গলের একমাত্র আইন হচ্ছে কেউ কখনো আধুনিক পৃথিবীর কোনো বস্তু ... তা যত সামান্যই হোক... নিজ সংগ্রহে রাখলে তাকে হত্যা করা হবে...

সবাই এবার তাকাল ধরে রাখা তরুণের দিকে। তার মুখ অবশ্য ভাবলেশহীন। বৃদ্ধ তার দীর্ঘ দাড়ি-গোফে আঙুল চালিয়ে মুখ খুললেন—

এই তরুণ আধুনিক পৃথিবীর একটি নিদর্শন নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল ঠিক কিনা?

তরুণ মাথা নাড়ে।

জিনিসটা কি? আমরা দেখতে চাই। আশপাশ থেকে কয়েকজন দাবি করল নিচু গলায়।

দেখানো হবে এবং জিনিসটা সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করা হবে। তার আগে বল তুমি এটা কোথায় পেয়েছ?

একটা পাহাড়ের খাদে পড়ে ছিল। মাটির নিচে।

সেটা থাকতেই পারে। কিন্তু তুমি কেন সেটা নিজের সংগ্রহে রাখলে? তুমি জান না আমরা ভয়ঙ্কর আধুনিক পৃথিবী থেকে সব সময় দূরে থাকতে চাই।

জানি।

তাহলে কেন এ কাজ করলে?

জিনিসটা দেখতে সুন্দর তাই ...

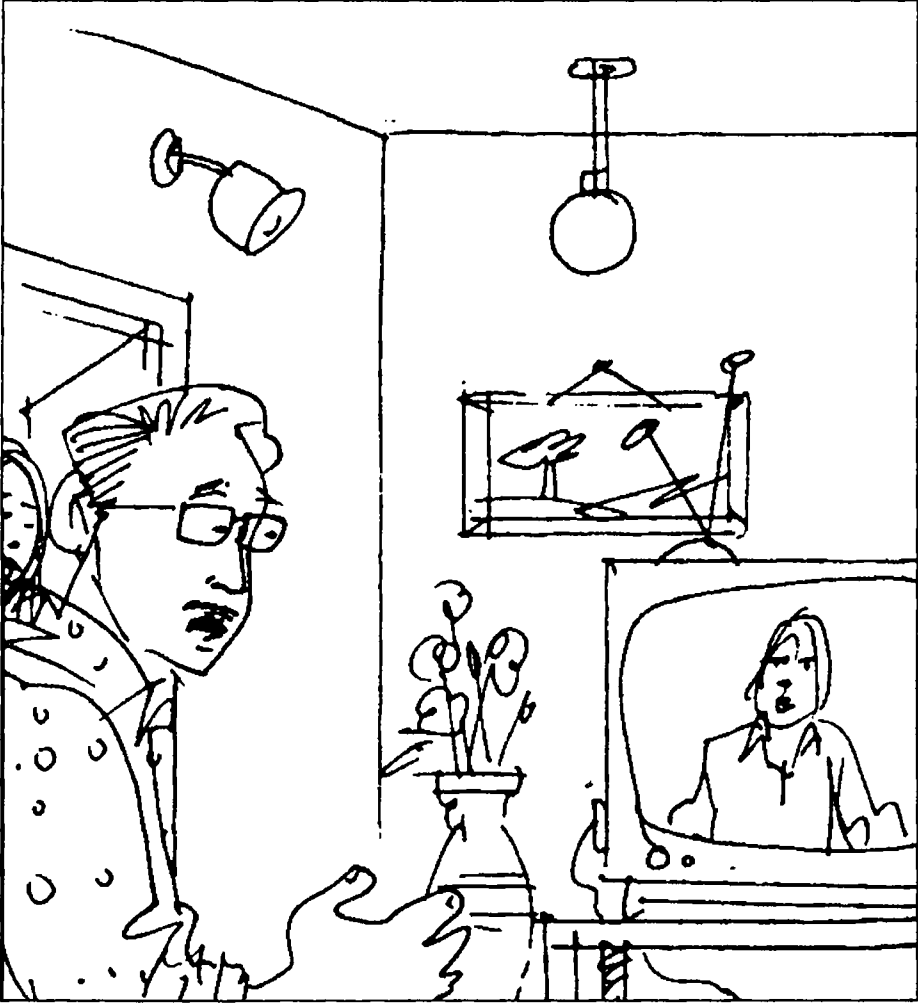
জিনিসটা কি? আমরা দেখতে চাই। সবাই আবার চৈতাল, এবার একটু উচ্চস্বরেই।

আস্তু। বৃদ্ধ একজনকে নির্দেশ দিলেন। সেই নির্দেশগ্রাপ্ত লোকটি লতা-পাতায় জড়ানো একটা গোল জিনিস নিয়ে এল সবার সামনে। সূর্যের আলোয় জিনিসটা চকচক করে উঠল।

জিনিসটা আসলে তেমন কিছুই ছিল না। ২০১২ সালের কম্পিউটারের একটা কমপ্যাক্ট ডিস্ক... মানে সিডি। নষ্ট ময়লা... মাটি লেগে আছে। তারপরও চক চক করছে।

জিনিসটাকে এক নজর দেখে বৃদ্ধের নির্দেশে একজন সঙ্গে সঙ্গে ভো ফেলল টুকরো টুকরো করে । তারপর ছুড়ে দিল দূরে । কমপ্যাঙ্ক ডিস্কে ভাঙা টুকরোগুলো উঁচু পাহাড় থেকে ছিটকে পড়ল অনেক নিচে. নিঃশব্দে... ।

তারপর অপরাধী তরুণটিকেও ছুড়ে দেওয়া হল পাহাড়ের উঁচু খ থেকে । তরুণটি অবশ্য ভাঙা কমপ্যাঙ্ক ডিস্কটির মতো নিঃশব্দে ছড়ি পড়ল না নিচে । সে একটা ভয়ঙ্কর আতঁচিৎকার করল, ‘...আআআআআ ...আআআ...!!’ তার আতঁচিৎকার পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি হল...বার বার!!



## এ্যালিয়েন

স্যার জিনিসটার দাম কিন্তু একটু বেশি পড়বে ।

কত?

তিন কোটি ।

তোমাদের কি মাথাটাতা খারাপ হইছে?

মাথা খারাপ হওয়ারই অবস্থা স্যার । যে জিনিস পাইছি ।

আমি বিশ্বাস করি না ।

সেইটা স্যার আপনার অভিরুচি । তাইলে কি স্যার অন্য ক্লায়েন্ট দেখব?

ও পাশে একটু নিরবতা । তারপর কথা শোনা গেল ।

জিনিসটা আমি আগে এক নজর দেখতে চাই ।

তা দেখতে পারেন ।

কখন দেখাবে?

চাইলে আজকেই ।

ঠিক আছে ।

তাইলে স্যার গাড়ি পাঠাই?

কেন আমার গাড়িতে আসলে সমস্যা?

স্যার একটু সমস্যা আছে, আমাদের গাড়িতেই আসেন । বুঝেন তো স্যার জিনিসটা টপ সিক্রেট । আপনাকে আবার নামায়া দিয়া আসব আমরা ।

আচ্ছা ঠিক আছে গাড়ি পাঠাও ।

স্যার এক ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি আপনার বাসায় পৌঁছে যাবে । একটা লাল টয়োটা গাড়ি স্যার... স্যার আরেকটা কথা বেয়াদবি না নিলে—

কি কথা ?

জিনিসটা দেখার পর পছন্দ হইলে কিছু কি এ্যাডভান্স করবেন?

সেটা... আগে দেখি তো ।

জি আচ্ছা... জি আচ্ছা

শিল্পপতি মিজারুল কায়েস ফোন রেখে দিলেন । তার ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানায় নতুন একটি জিনিস সংযুক্ত হতে যাচ্ছে । তিনি ভিতরে ভিতরে উত্তেজনা বোধ করছেন জিনিসটা সত্যি হলে তিন কোটি টাকা কোনো বিষয় না ।

খাঁচাটার সামনে এসে বেকুব হয়ে গেলেন শিল্পপতি মিজারুল কায়েস ।

তু-তুমি শিওর এটা একটা এ্যালিয়েন?

ওভার শিওর স্যার ।

তোমরা একে কিভাবে পেলো?

সেটা স্যার বিরাট কাহিনী। গেছিলাম বান্দরবন বেড়াতে। এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠছি দলবল নিয়া, সময়টা বিকাল। হটাৎ দেখি কি একটা আকাশ থাইকা ছুইটা আসতাছে আমাদের দিকে। আমরা ভাবলাম কোন প্লেন ক্রাশ করতে যাচ্ছে... ঠিক ঠিক ক্রাশও করল ঐ পাহাড়ের মাথায়। আমরা আগেই সরে গেছিলাম নিরাপদ দূরত্বে। দেখলাম একটা গোল চাকতির মতো পুরাটা এ্যালুমিনিয়ামের মতো কিছু দিয়া তৈরি। ভিতর থাইকা এই প্রাণীটা বাইর হয় আসল। এরকম আরেকটা প্রাণী ছিল সে অবশ্য স্পট ডেড।

বল কি? ঐ চাকতিটা কই?

চাকতিটা স্যার ঐ খানে আমরা লুকায়া রাইখা আসছি। ঐটা স্যার পরে বেচুম কাইটা কাইটা বেচতে হইব ধোলাই খালে। পাবলিক টের পাইলে বিপদ আছে।

শিল্পপতি মিজারুল কায়েস এবার ভালো করে প্রাণীটাকে লক্ষ্য করলেন। মাথাটা অক্টোপাসের মতো শরীরটা বানরের। চোখ একটা, ছোট কপালের মাঝখানে। প্রাণীটা মাথা ঘুরিয়ে তাকাল শিল্পপতি মিজারুল কায়েসের দিকে। ঠিক তখনই মাথাটা ব্যাথা করে উঠল মিজারুল কায়েসের।

এ খায় কি?

সবই খায় স্যার... যাই দেই তাই খায় স্যার তবে ইয়ে করে না।

ইয়ে করে না মানে?

মানে টয়লেট করে না।

তাই নাকি ?

জি স্যার... বিরাট সুবিধা।

হুম।

স্যার চলেন একটু চা খাই।



চল ।

আফজালের অফিস রুমে এসে বসলেন শিল্পপতি মিজারুল কায়েস ।  
আফজালের কাঁটাবন পেটসপে তিনটা দোকান আছে । পাখি, খরগোশ,  
মাছ, কুকুর সবই বিক্রি করে সে । মাঝে মাঝে গোপনে এনডেঞ্জার্ড  
স্পেসিসও বেচে । যার গোপন কাস্টমার শিল্পপতি মিজারুল কায়েস ।  
ঝকঝকে কাপে চা দিয়ে গেল একটা ছেলে । দরজা বন্ধ করে দিয়ে চেয়ার  
টেনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল পেট ব্যবসায়ী আফজাল হোসেন ।

স্যার জিনিস কি পছন্দ হইছে?

তা হইছে ।

তাহলে স্যার...

তবে একটা কথা ।

বলেন স্যার ।

আমি ঐ চাকতিটাও কিনতে চাই ঐটা সহই একটা দাম ধইরা দেও ।

মানে স্যার ওদের সসারটা?

হু ।

তাইলে স্যার সমান সমান পাঁচ দিয়া দিয়েন ।

ঐ মিয়া তোমার সমস্যা কি?

স্যার জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করেন ঐ বান্দরবন থাইকা জিনিসটা...  
মানে ঐ সসারটা গোপনে বাস্তব কইরা গাজীপুরে আপনার চিড়িয়াখানায়  
পৌছাইতে হইব । কাজটা স্যার খুবই জটিল ।

তা বুঝলাম কিন্তু পাঁচ কোটি কেমনে? ঠিক আছে যাও চাইর দিব ।

না স্যার আরেকটু বাড়েন ।

না না আর সম্ভব না ।

যান চার পঞ্চাশ দিয়েন ।

না না সম্ভব না । তাইলে শুধু এ্যালিয়েনটাই দেও... ।

ঠিক আছে যান চার ত্রিশ...

আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার ঐ সসারটার কোনো ছবি?

আছে স্যার এই যে দেখেন। আফজাল তার টাচ স্ক্রিন মোবাইলটা বের করে দেখায়। ছবি দেখে শিউরে ওঠেন শিল্পপতি মিজারুল কায়েস। সায়েন্স ফিকশন মুভিতে যেমন সসার দেখা যায় আকাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, হুবহু তেমনই সসারটা।

তিন কোটি টাকার একটা ওপেন চেক দিয়ে বাড়ি ফিরলেন শিল্পপতি মিজারুল কায়েস। বাকিটা জিনিস বুঝে পেয়ে দেবেন। বহুদিন পর দারুণ পুলকিত বোধ করছেন তিনি। অবশেষে একটা এ্যালিয়েনের মালিক হতে যাচ্ছেন তিনি। ভিনগ্রহের একটা প্রাণী থাকবে তার ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানায়... ভাবা যায়!

সেদিন দুপুরে তিনি বড্ড আরামে ঘুমালেন। সন্ধ্যায় জ্বর ডাকে উঠে চা-নাস্তা খেয়ে রাওয়া ক্লাবে গেলেন। তিনি ঢাকার প্রায় সব ক্লাবেরই মেম্বর। একেক দিন একেক ক্লাবে যান। আজ রাওয়া ক্লাব। রাওয়া ক্লাবে কিছুটা সময় কাটিয়ে ফিরে এলেন বাসায়। তখন দশটা বাজে... দশটার খবরটা সাধারণত তিনি নিয়ম করে দেখেন।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বিশাল প্লাজমা টিভির দিকে তাকালেন...

খবর পড়ছি আমি সুমাইয়া জাহাঙ্গির.... প্রথম দিকে কিছু টিপিক্যাল বিরক্তিকর রাজনৈতিক খবর। তারপর হটাৎ চমকে ওঠেন শিল্পপতি মিজারুল কায়েস। খবরের পাঠক বলছে... আজ সন্কার কিছু আগে এক প্রতারক চক্রকে ধরা হয়েছে। তারা পেটসপের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তবে গোপনে এ্যালিয়েন বলে অদ্ভুত দর্শন কিছু প্রাণী বিক্রি করে। এই এ্যালিয়েনগুলো অবশ্য তারাই তৈরি করে...

হতভম্ব হয়ে শিল্পপতি মিজারুল কায়েস দেখেন আজ সকালে তার দেখা খাঁচার ভিতর সেই প্রাণীটাকে দেখানো হচ্ছে। হাতে হ্যান্ডকাফ পরা আফজালকেও দেখানো হল। সে মুখ আমসি করে দাঁড়িয়ে আছে। এক পর্যায়ে সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করল—

আচ্ছা আপনি এই প্রাণীটা, যেটাকে এ্যালিয়েন বলে চালাচ্ছেন এটা কিভাবে তৈরি করলেন?

প্রথমে একটা মরা অক্টোপাস জোগাড় করি, তারপর তার নাড়িভুড়ি বাইর কইরা খালি চামড়াটা বানরের মাথায় পরায়া দেই।

বানরটা আপত্তি করে না?

না ট্রেইন্ড বানর।

কিন্তু চোখ যে একটা... এটা কিভাবে?

অক্টোপাসের চামড়া ফুটা কইরা বানরের একটা চোখ দেখাই...

বা বা দারুণ বুদ্ধি। আচ্ছা ক'জনের কাছে এটা বিক্রি করেছেন?

তিনজনের কাছে।

কত করে? একজনের কাছে দুই কোটি, একজনের কাছে তিন আরেকজনের কাছে চাইর ত্রিশ।

মানে শেষ জনের কাছে চারকোটি ত্রিশ লক্ষ?

জি, উনি সসারসহই নিবেন তো।

ও আপনারা সসারও বেচেন?

চারিদিকে একটা হাসির হুল্লোড় ওঠে।

জি বেচি।

সসার পান কই?

আমরাই বানাই... বিদেশি সায়েন্স ফিকশন ছবি দেইখা

বা বা বা... আচ্ছা এরা কারা? আপনার ক্রেতারা? নাম বলেন...

এ পর্যায়ে টিভি বন্ধ করে দেন শিল্পপতি মিজারুল কায়েস। তার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছে!

কি হল টিভি বন্ধ করলে কেন? স্ত্রী বিরক্ত হয়ে তাকান স্বামীর দিকে।

নাহ মাথা ব্যাথা করছে।

শুয়ে থাক গিয়ে।

যাই। এ সময় দরজায় তাদের কেয়ারটেকার মিজানকে দেখা যায়।

স্যার প্লামালিকম ।

কি ব্যাপার মিজান?

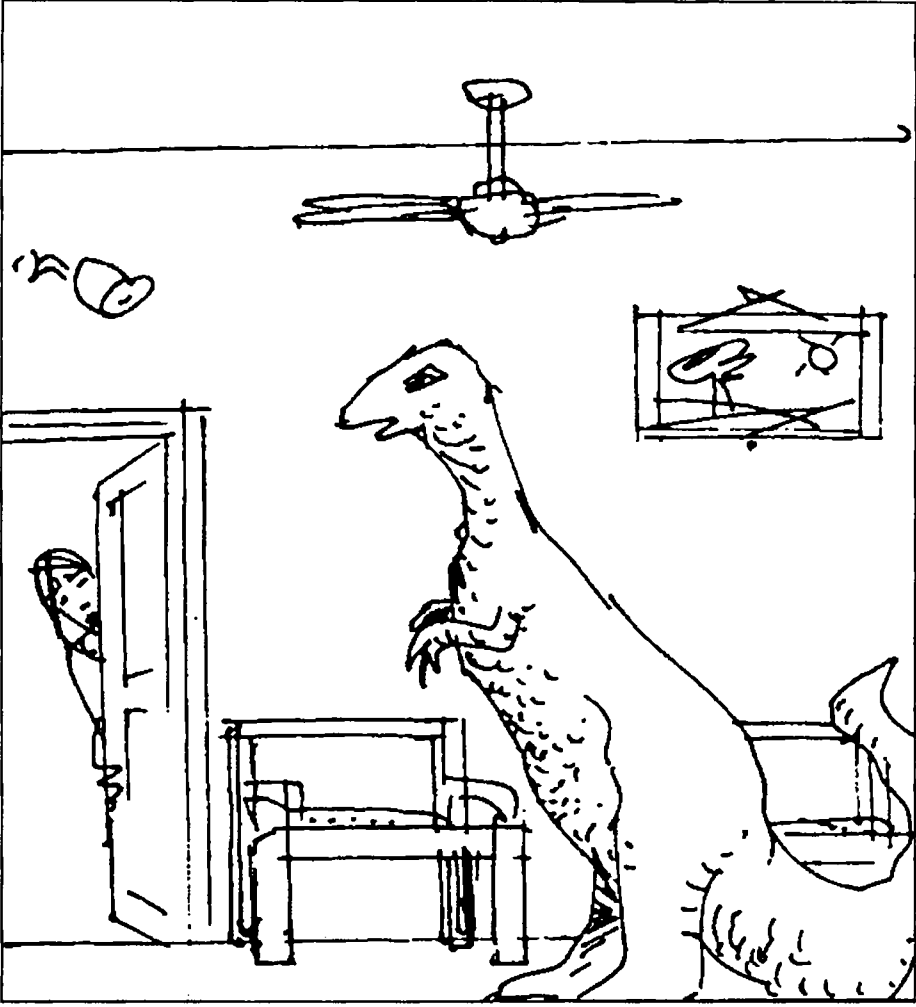
স্যার একটা খারাপ খবর আছে ।

কি খারাপ খবর? শিল্পপতি মিজারুল কায়েসের স্ত্রী উঠে বসেন  
আতঙ্কে, আবার কি হল!

ইয়ে মানে আমাদের গাজিপুরের চিড়িয়াখানার গাধাটা আজ সকালে ।  
মারা গেছে ।

উফ... স্ত্রী আফিয়া নিঃশ্বাস ফেলে সোফায় আরাম করে হেলান দিয়ে  
বলেন, ‘তাও ভালো তুমিতো আমাকে ভয় খাইয়ে দিয়েছিলে... ঠিক আছে  
যাও এখন ।’

শিল্পপতি মিজারুল কায়েস চুপচাপ বসে থেকে মনে মনে ভাবেন...  
‘ভালোই হল । ঐ গাধার খালি খাঁচায় কাল থেকে তিনি নিজেই বসে থাকলে  
কেমন হয়?’



## বিগ ব্যাঙ

তাহলে স্যার বিগব্যাঙ দিয়েই সব কিছুর শুরু?

হ্যাঁ।

সময়ও কি বিগব্যাঙ থেকেই শুরু?

হ্যাঁ।

স্যার বিগব্যাঙ এর আগে কি ছিল?

সেটা বিজ্ঞানীরা এখনো বের করতে পারে নি। তবে আমরা ধারণা করতে পারি...

কি ধারণা করতে পারি?

সব গুরুর আগে কি থাকে?

কি থাকে?

ভেবে দেখ ।

আমি এত ভাবতে পারি না তুমি বল ।

সব গুরুর আগে থাকে কল্পনা ।

ঠিক ঠিক... আমরা কিছু গুরু করার আগে জিনিসটা কল্পনা করি ।

ধরতে পেরেছিস তুই । তার মানে গুরুর আগে হচ্ছে কল্পনা । এই বিগব্যাণ্ডটা কেউ কল্পনা করেছে আগে ।

কে সে? ঈশ্বর??

দেখ ঈশ্বরের ভাবনাটাও কিন্তু সেই বিগব্যাং থেকেই গুরু । আর আমরা কিন্তু বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলছি ।

ও আচ্ছা... তাহলে কে কল্পনা করেছে?

সেটা তুই ভেবে দেখ । তোকে আধা ঘণ্টা সময় দিলাম । আমি চট করে গোসলটা সেরে আসি । তুই কিন্তু খেয়ে যাবি আজ, তোর বৌদি তোর জন্য রান্না করেছে ।

আচ্ছা... আচ্ছা... বলে সজল । তারপর গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে । ব্রেনটাকে জোর করে । জোর করলে নাকি ব্রেনের সিনাপস্ কানেকশন বাড়ে । সজল চোখ বন্ধ করে ব্রেনের সিনাপস কানেকশন বাড়ানোর আশ্রয় চেষ্টা করে । খুব একটা লাভ হয় না । হটাৎ তার মনে হয় চট করে একটা সিগারেট খেয়ে আসলে কেমন হয় । শঙ্কর দাদার সামনেতো আর সিগারেট খাওয়া যাবে না । সে উঠে পড়ে ।

এই কোথায় যাচ্ছিস?

বৌদি একটু আসছি ।

সিগারেট খেতে?

জিভ কাটে সজল । যার অর্থ প্লিজ শঙ্কর দাদাকে বলো না । সে বের হয়ে যায় । বাইরের ছাপড়ার দোকানে এসে একটা সিগারেট কিনে ধরায় । নতুন নতুন সিগারেট খাওয়া শিখেছে সজল । সে ঠোঁট সরু করে একটা রিং ছুড়ে শুন্যে... রিংটা আস্তে আস্তে বাতাসে মিলিয়ে যায় ।

সে সিগারেট হাতে একটু এগোয় । একটা বাড়িতে কাজ হচ্ছে । বাইরে চট দিয়ে ঢাকা । সজল সিগারেট হাতে কাজ দেখে । সে খেয়ার করল । বাড়িটা তৈরি হচ্ছে না । রেনোভেশন হচ্ছে । একটা পুরোনো বাড়িকে ঠিক করা হচ্ছে । বাড়ির সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে সে আরেকজনকে বোঝাচ্ছে । সম্ভবত লোকটা ইঞ্জিনিয়ার ।

ভিতরের ড্রপওয়ালগুলো সব ভেঙে ফেল

কিন্তু স্যার পুরোনা বাড়ি যদি...

আরে বাবা কোনো রিস্ক নাই বললাম তো... ড্রপ ওয়াল কখনো মূল বাড়ির লোড নেয় না । তুমি নিশ্চিন্তে ভাঙ । আরেকটা কথা কালকে বাইরের ওয়ালে গ্রুপিং করবা...

সজল তাদের কথা শুনে কিছু বোঝার চেষ্টা করে । কিন্তু বোঝে না । ওদের টেকনিক্যাল কথা তার বোঝার কথা না । সে সিগারেটটা ফেলে পেছন ফিরে শঙ্করদার বাড়ির দিকে হাঁটা দেয় । শঙ্করদার প্রচুর পড়াশুনা । তার কাছে মাঝে মধ্যে আসে বিজ্ঞান নিয়ে কথা-বার্তা বলে ।

শঙ্কর দা ড্রপ ওয়াল কি?

ড্রপ ওয়াল হচ্ছে, যে ওয়াল মূল বাড়ির লোড নেয় না ।

আশ্চর্য ।

কিসের আশ্চর্য ?

তুমি এটাও জান?

জানব না কেন... আমিতো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং... দাঁড়া... দাঁড়া...

কি হল?

আমার আসলে তোর প্রশ্নের উত্তরটা জানার কথা নয় । তাহলে আমি কিভাবে বললাম? ...আমি তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি নি । আমি ফিজিক্সের ছাত্র...

শঙ্করদা খুব অবাক হয়ে তাকালেন সজলের দিকে ।

আমার মনে হচ্ছে কি জানিস?

কি?

বিগ ব্যাং এর কারণে তৈরি হয়েছে ১০ টুদি পাওয়ার ১০১৬ টি ইউনিভার্স।

একটার ভিতরে আরেকটা ইউনিভার্স ঢুকে আছে। সেরকম পৃথিবীও একটার ভিতর আরেকটা ঢুকে আছে... সে কারণে...

মিলিয়নস অব প্যারালাল ওয়ার্ল্ড।

ইউনিভার্সের নিয়মানুযায়ী ইনফিনিট তুই আমি থাকার কথা। সেই রকম একটা ঘটনার সঙ্গে আমরা কনফ্লিক্ট করেছি... অন্য তুই, অন্য আমি...

বুঝতে পারছি না আমি, শঙ্করদা তুমি কি বলতে চাচ্ছে?

অলটারনেটিভ রিয়েলিটি। একটা কোয়ান্টাম ঘটনা দিয়ে দুইটা পৃথিবী আলাদা... এক জায়গায় মানুষ থাকলে অন্য জায়গায় ডাইনোসর আছে।

সজল কিছু না বুঝে তাকিয়ে থাকে শঙ্করদার দিকে...

এই তোমরা খেতে আস। টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে।

বৌদি চোঁচিয়ে জানান। কিন্তু তাদের কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে ড্রইং রুমে এসে দেখে তারা নেই। কিন্তু একটু আগেও তাদের কথা শোনা যাচ্ছিল! গেল কোথায়? কিন্তু ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। কেমন একটা আঁশটে গন্ধ নাকে আসে। আর তখনই বৌদির নজরে পড়ে জিনিসটার দিকে। জিনিসটার মাথা ছাদ স্পর্শ করেছে। একটা ডাইনোসর, সত্যি ডাইনোসর... ঘাড় ঘুরিয়ে আস্তে করে তাকাল বৌদির দিকে। বৌদি একটা চিৎকার দিলেন...!!





সূর্য যেখানে নীল

তোমাদের সূর্যটা তাহলে নীল?

হ্যাঁ ।

নীল কেন?

তোমাদের সূর্যটা লাল, কারণ সেখানে ফিউশন প্রক্রিয়ায় তাপ তৈরি হয় । আর আমাদেরটা...

তোমাদেরটা ?

আমাদেরটা আমরা তৈরি করেছি ।

মানে?

মানে নীল রংটা আমাদের প্রিয় তাই আমরা ভাবলাম আমাদের আকাশে একটা নীল রংয়ের সূর্য থাকলে কেমন হয়। আমাদের মেন্টররাও আমাদের সাথে একমত হল।

আশ্চর্য!

আশ্চর্যের কিছু নেই। তোমরা যেমন ইচ্ছেমতো বাড়ি-ঘর তৈরি কর তোমাদের পছন্দ মতো, সেরকম আমরাও একটা সূর্য তৈরি করলাম আমাদের পছন্দ মতো।

তা হলে আমাদের সূর্য যেমন আমাদের তাপ দেয় শক্তি দেয় ব্যাপারটা সেরকম নয়?

না... কখনই নয়... সৌন্দর্য বলতে পার।

আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে তোমাদের গ্রহে যেতে।

সত্যি যেতে চাও?

হ্যাঁ।

তাহলে চল।

এখন?

হ্যাঁ সমস্যা কি?

কিন্তু তোমার সঙ্গে তো কোনো স্পেসশিপ নেই।

আমাদের ট্রাভেল করতে স্পেসশিপ লাগে না। আমরা ইমাজিনারী ট্রাভেল করি।

মানে?

মানে বিষয়টা জটিল। আমি যে তোমার সাথে কথা বলছি তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

না।

তাতে কি কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে আমার সাথে?

না।

তুমি ভয় পাচ্ছ?

না।

তাহলে কি তুমি যাবে আমার সাথে?

যেতে পারি কিন্তু কখন ফিরব?

ফিরবে মানে?

মানে আমি আমার বাসায় ফিরে আসব না? আমার ঘরে?

আচ্ছা এক মিনিট ।

বল ।

তুমি মেয়ে না ছেলে ?

কেন মেয়ে । তুমি কি?

আমি... আমরা একই সঙ্গে ছেলে একই সঙ্গে মেয়ে! তাহলে তুমি  
যাওয়ার জন্য তৈরি?

কিন্তু বললে না আমি কখন ফিরব?

বোকা মেয়ে আমি তো তোমার শরীরটাকে নিচ্ছি না । আমি তোমার  
মাইন্ডটাকে নিয়ে যাচ্ছি... তবে তোমাকে নিতে হবে তোমার মতো করে ।

মানে?

মানে তুমি যাতে ওখানে গিয়ে মনে না কর তুমি এসে ভুল করেছ ।

মানে কি? কি হল? কই তুমি? শুনছো?

শুনছি ।

তুমি উঠে দাঁড়াও ।

মানে?

মানে কল্পনায় যে সিঁড়িটাতে বসে আছো সেখান থেকে উঠে দাঁড়াও...  
দাঁড়িয়েছি ।

এক পা এগোও

এক পা এগুলো আমার মনে হচ্ছে ...

কি মনে হচ্ছে ?

মনে হচ্ছে ঝামেলায় পড়ব ।

ওপাশে হাসির মতো একটা শব্দ হল । তবে সাঈদা একপা এগুলো  
সামনের দিকে । সে ঠিক কোন সিঁড়িতে বসেছিল? পাবলিক লাইব্রেরীর  
সিঁড়িতে? মনে করার চেষ্টা করে সে! মানুষটাকে ডাকে—

এই যে শুনছেন?... শুনছেন?

মানুষটা আর কথা বলে না ।

এর পরে সাঙ্গিদার সাথে আর যোগাযোগ হল না মানুষটার। মানুষ? না মানুষ বলা যায় না। তাহলে এ্যালিয়েন? সেটার সম্ভবনা আছে। কারণ সে বলছিল তাদের সূর্যটা নীল। আরো কি সব বলছিল। সাঙ্গিদা তার প্রিয় লেপটা সরিয়ে বিছানায় উঠে বসে। তার লেপের নিচে সে অন্য কাউকে ঢুকতে দেয় না। তার বিড়ালটা মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ে অবশ্য।

সে কি স্বপ্ন দেখছিল? না সেটা সম্ভব না, কারণ সে সিরিয়াস ইনসমনিয়া রোগী। সে পুরোপুরি ঘুমুতে পারে না। তন্দ্রার মধ্যে ঢুকে কেমন একটা ঝিমুনির মতো আসে... তখন সে...

সাঙ্গিদা নিজেই একটা জিনিস গবেষণা করে বের করেছে। সে ঐ অর্ধ-তন্দ্রা অর্ধ-জাগরণের সময়... চোখ বন্ধ করে কল্পনার মধ্যে ঢুকে যায়। অতীতের স্মৃতির সঙ্গে কল্পনার মিশেল দিয়ে অন্য একটা পরাবাস্তব জীবনে ঢুকে পড়ে সে... এই সময় তার সঙ্গে যোগাযোগটা হয়... একটা মানুষের সঙ্গে... যোগাযোগটা যে কিভাবে হয় সে নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। অনেকটা যেন মোবাইল ফোনে এসএমএস করার মতো... কিন্তু মাঝখানে মোবাইলটাই নেই...

কিরে সাঙ্গিদা উঠলি না?

এইতো উঠছি ...

টেবিলে নাস্তা দেয়া হয়েছে সেই কখন। নাস্তা খেতে আয়...

এইতো আসছি।

আয় বলছি।

এইতো আসছি...

এইতো আসছি... এইতো আসছি এই কথাটা মনে হচ্ছে আশি বার না বলে বিছানা থেকে নামবি না।

সাঙ্গিদা হাসে। তার মা শিবরামের খুব ভক্ত শিবরাম চক্রবর্তির। কথায় কথায় তার লেখা থেকে সংলাপ কোট করে। যেমন এখন করল। শিবরামের একটা গল্পে আছে, মেয়েরা নাকি বিদায় নেবার সময় 'নাহ এবার আশি' এই কথাটা আশিবার না বলে যায় না। মা সেটাই এখন জায়গামতো ঝাড়ল। শিবরাম সম্পর্কে একটা মজার তথ্য পেয়েছে সে। শিবরাম

চক্রবর্তী তার জীবন কাটিয়েছেন হোটেলের একটা রুমে, যার দেয়াল জুড়ে লেখা থাকত তার সব নোট। মজার ব্যাপারটা অন্যখানে। তার ঘরের পাপোষটা নাকি থাকত ঘরের ভিতরে। তার দর্শন হচ্ছে বাইরের ধুলো ঘরে ঢুকুক সমস্যা নেই, তার ঘরের ধুলো যেন বাইরে না যায়! কি অদ্ভুত! তথ্যটা মাকে জানাতে হবে। মা নিশ্চয়ই খুশি হবে!

সাঁঙ্গদা উঠে পড়ে বিছিনা ছেড়ে। বাইরে চমৎকার রোদ উঠেছে অনেকদিন পর। রোদের ঝাপটা এসে লেগেছে জানালায়। পর্দাটা ঝক ঝক করছে। বাথরুমে ঢুকে ব্রাশে টুথপেস্ট লাগিয়ে, ব্রাশ হাতে জানালায় এসে দাঁড়ায়। এ দৃশ্য মা দেখলে ক্ষেপে যাবে। মা সব সময় বলে বাথরুমের কাজ বাথরুমে, খবরদার বাইরে এসে দাঁত ঘষবে না ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। দু মিনিটের বেশি দাঁত মাজলে দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়ে যায়... লেকচার শুরু হয়ে যায় মায়ের, মা যে এক সময় শিক্ষক ছিলেন সেটা ভুলতে পারেন না। তারপরও কি মনে করে নিয়ম ভঙ্গ করে সাঁঙ্গদা ব্রাশ হাতে জানালার কাছে এসে পর্দাটা সরায়। উঁকি দেয় বাইরে সূর্যটার দিকে... আর তখনই তার হাত থেকে ব্রাশটা পড়ে যায়। সে এটা কি দেখছে? আকাশে ঝকঝক করছে একটা নীল সূর্য!

মা ... চোঁচিয়ে উঠল সাঁঙ্গদা।

চিৎকার শুনে ছুটে এলেন মা।

কি হয়েছে ?

দেখ।

কি দেখব?

বা-বাইরের সূর্যটা

-মানে?

জানালা দিয়ে বাইরের সূর্যটার দিকে তাকাও...

মা অবাক হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ঞ্চ কুচকে সূর্যটাকে খেয়াল করল।

সমস্যা কি?

মা দেখেছ?

আহ দেখবটা কি বুঝতে পারছি না ।

সূর্যটা নীল না?

মা অবাক হয়ে তাকালেন সান্দাদার দিকে । ‘হ্যাঁ সূর্য যেমন হয় তেমনি আছে’ সান্দাদা অবাক হয়ে চোখ কুচকে আবার তাকায় বাইরে, না অবশ্যই নীল... ঝকঝকে নীল একটা সূর্য ।

কিন্তু আমি তো দেখছি নীল । নীল একটা সূর্য ।

হ্যাঁ নীল সূর্য ? তো সমস্যা কি?

বাহ সূর্যতো একটা তারা... জ্বলজ্বলে হলুদ কখনো টকটকে লাল...

উফ কি সব বলছিস । তোর সমস্যাটা কি বলতো? কি সব উল্টা-পাল্টা বলছিস? অনেক হয়েছে এখন নাস্তার টেবিলে আয় তো নাস্তা দেয়া হয়েছে ।

খাওয়ার টেবিলে নীল সূর্য নিয়ে আলোচনা শুরু হল । আজ শুক্রবার বলে সবাই আছে । বাবাও আছেন ছোট বোন-নিতুও আছে ।

আমার মনে হয় আপু কালার ব্লাইন্ড হয়ে গেছে । বলছে আমাদের সূর্যটা নাকি লাল ছিল । হলুদ ছিল হি হি...

নিতু কতবার বলেছি খাওয়ার সময় কথা বলবে না । মা ধমক লাগান ।

এ বিষয়টা নিয়ে আমি পরে কথা বলব । এখন সবাই নাস্তা খাও । বাবা উঁচু গলায় বলেন ।

আমার মনে হয় ওর ইনসমনিয়াটা নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে আরেকবার কথা বলা দরকার । ভালো ঘুম হচ্ছে না বলে... উল্টা পাল্টা... ।

আহ নিলুফার বললাম তো এ নিয়ে পরে কথা হবে ।

নাস্তার টেবিলে সবাই চুপচাপ খেতে শুরু করল । সেই মার টিপিক্যাল নাস্তা পরোটা ডিম আর ভাজি । নিলু পরোটা আর ভাজি নিল ডিম তার ভালো লাগে না । বাবা পেপার পড়ছেন । প্রথম আলো.... হেডিংটা পড়া যাচ্ছে এখন থেকে । বিদ্যুতের দাম আরেক দফা বাড়ল... এই টাইপের কিছু ।

পাশে উপরে শিশিরের কার্টুন। হঠাৎ খেয়াল করল নিলু শিশিরের কার্টুনটাতে একটা সূর্য আঁকা... সেটাও নীল রঙের। এর মানে কি? তবে কি সে চলে এসেছে সেই মানুষটার কথা মতো নীল সূর্যের গ্রহে?? নীলুর বুকটা ধক করে উঠল।

সান্দিদা পরোটা শেষ করো। মা ধমক লাগান আবার।

সান্দিদা প্রবল অস্বস্তি নিয়ে ভাজি দিয়ে পরোটা খায়। কোনো কারণ ছাড়াই তার ভয় করছে।

চা খেতে খেতে বাবা প্রসঙ্গটা তুললেন। ছোট বোন নিতু চলে গেছে তার রুমে। মাও নেই। বাবা নিচু গলায় বললেন—

সূর্য নীল সব সময়ই ছিল। তোর কেন এমন ধারণা হল সূর্য হলুদ বা লাল?

বাবা আমি জানি সূর্য হলুদ ...সূর্যাস্ত সূর্য উদয়ের সময় লাল... টকটকে লাল। আমার কাছে ছবি আছে।

যা ছবিটা নিয়ে আয় তো।

সান্দিদা ছুটে গেল। ড্রয়ার খুলে গত বছর কক্সবাজারে গিয়ে তোলা ছবির প্রিন্টগুলো বের করে। বের করেই হতভম্ব হয়ে যায়। ফটোতেও সূর্যটা নীল! কিভাবে সম্ভব?

কিরে ছবি দেখি?

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বাবা দরজায় দাঁড়িয়ে। মিটি মিটি হাসছে।

ফটোতেও তোর সূর্য নীল?

হ্যাঁ।

শোন পাগল মেয়ে আমাদের এই গ্রহের সূর্য সবসময় নীল। তুই কেন হলুদ লাল বলছিস? হঠাৎ করে বুঝতে পারছি না। মনে হয় তোর ইনসমনিয়াটা বেড়েছে বলে ভালো ঘুম হচ্ছে না, বা কোনো সমস্যা হয়েছে...

ইনসমনিয়ার সাথে এর সম্পর্ক কি আমি জানি না। সূর্য হলুদ... অবশ্যই হলুদ চোঁচিয়ে ওঠে নীলু।

তার চিৎকার শুনে মা আর নিতু ছুটে আসে। সাঈদা খেয়াল করে তারা তিনজনেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। অবাক তাকিয়ে আছে। তাদের তাকানোর ভঙ্গিতেই বোঝে গেল নীলু ওরা তার আসল বাবা মা না। মা ফিস ফিস করে বলল—

ও নিতে পারছে না...

ঠিক, বাবা বলে।

আপুকে বরং বল যে আমাদের সূর্যটা নকল... তৈরি করা ওদেরটার মতো না।

ওদের কথাগুলো সব কানে আসছিল সাঈদার। হঠাৎ বাবাটা চোঁচিয়ে উঠল—

এই মেয়ে তুমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়। লেপ দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেল। চলে যাও... চলে যাও... আমাদের মেন্টররা তোমাকে সাহায্য করবেন। আর কখনো এভাবে আসবে না খবরদার!

বলে নিজেই দরজা বন্ধ করে দেন তিনি। সাঈদার কি হল বিছানায় উঠে ভারি লেপ দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলে। গাঢ় অন্ধকারে সে ডুব দেয় অতীত স্মৃতি আর কল্পনার মিশেলে... যার মাঝখানে তার নিজস্ব একটা জগৎ যেখানে কেউ একজন তাকে ডাকে ডাকবেই... অবশ্যই ডাকবে।

সাঈদার আজ ভালো ঘুম হয়েছে। ঘুম থেকে জেগে এক ধাক্কায় তার প্রিয় লেপটা ফেলে দেয়। সকালের রোদ জানালায় এসে পড়েছে। ঝকঝকে রোদ। কি যে হল সাঈদা এক লাফে উঠে জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দেয় আকাশের দিকে। ঝক ঝক করছে হলুদ একটা সূর্য... তাকানো যায় না। বুকটা শান্তিতে ভরে যায় তার। বিছানায় এসে ধপ করে বসে সে কি শান্তি কি সব উদ্ভট কল্পনা করতে গিয়ে... নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছিল। ‘র‍্যাম’ সিমুলেশনে ইনসমনিয়া রোগীরা যখন স্বপ্ন দেখে... তখন অনেক উল্টা-পাল্টা হয়... আর তখনই নজর গেল তার বিছানার উপর পড়ে থাকা ছবিটার দিকে। তারই ছবি... কক্সবাজার সী বীচে তোলা। পিছনে সূর্যটা নীল। যেই ছবিটা সে ড্রয়ার থেকে বের করে হাতে নিয়েছিল, একটু আগে অন্য এক সিমুলেশনে...।





তারা এসেছিল...

তুই এ্যালিয়েন বিশ্বাস করিস?

করি। তুই?

আমিও করি।

সেদিন ডিসকভারি চ্যানেলে দেখিয়েছে।

কি দেখিয়েছে?

বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর একটা ডকুমেন্টারীর মতো...উনি বলেছেন...

কি বলেছেন?

উনি বলেছেন... তিনি এ্যালিয়েনে বিশ্বাস করেন এবং মহাবিশ্বে  
অবশ্যই এ্যালিয়েন আছে ।

রাতের বেলা দুই বন্ধু ছাদে বসে গরু-গম্ভীর গল্প করছিল । উপরে  
খোলা আকাশ । ঝক ঝক করছে কোটি কোটি তারা । মফস্বল শহর বলে  
আকাশ অনেকটাই পরিষ্কার ।

আমি ঢাকায় খালার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম । ওখানে আকাশে  
একটা তারাও দেখা যায় না । কিন্তু আমাদের চাঁদপুর শহরে দেখেছিলাম কি  
সুন্দর কোটি কোটি তারা দেখা যায় ।

সত্যি । কি সুন্দর আকাশটা ।

আচ্ছা এমন যদি হয় আকাশ থেকে এখন একটা সসার উড়ে এসে  
কাছে কোথাও নামল তারপর একটা এ্যালিয়েন আমাদের কাছে এল ।

তারপর?

তারপর আমাদের জিজ্ঞেস করল, ‘তোমরা মানুষ?’

আমরা কি বলব তখন?

আমরা বলব, ‘হ্যাঁ আমরা এই পৃথিবীর মানুষ তোমরা কোন গ্রহ থেকে  
এসেছ?’

এহ এত সোজা?

মানে?

মানে তুই বললি আর এ্যালিয়েন চলে আসল । আর এ্যালিয়েন দেখলে  
আমাদের দুজনেরই কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে

তোর হতে পারে আমার হবে না ।

যা যা কি আমার সাহসী বীরেরে ...

কথার পিঠে কথা বলতে বলতে দুজনের মধ্যে বেশ লেগে গেল । ঝন্টু  
উচু গলায় বলল, ‘বেশতো তোর যদি এতই সাহস, থাক দেখি একা একা  
এই ছাদে আমি গেলাম...’

যা যা তোর মতো ভিতুর ডিমের আমার সঙ্গে থাকার দরকার নেই ।  
গেলাম ।

সাব্বির সত্যি সত্যি ধূপ-ধাপ পা ফেলে চলে গেল। ওদের দুজনের বাসা পাশাপাশি তারা মাঝে মাঝে এই পোড়ো বাড়িটার ছাদে এসে বসে। শুধু তারা না তাদের পাড়ার অনেকেই মাঝে মাঝে এই পুরোনো শ্যাওলা পড়া ছাদটায় এসে বসে গল্প গুজব করে। আজ অবশ্য ঘটনাচক্রে শুধু ঝন্টু আর সাব্বির বসে ছিল। আর এখন সাব্বির চলে গেল। ঝন্টুর সত্যি ভয় ভয় লাগছিল। কিন্তু এখনই যদি সে বের হয়ে যায় তাহলে সাব্বির ভাববে সে ভয় পেয়েছে। ঝন্টুর ধারণা সাব্বির ঠিকই বাইরে ঘাপটি মেরে আছে। ঝন্টু আকাশের দিকে তাকাল। তার হটাৎ মনে হল আকাশের একটা তারা যেন একটু বেশি উজ্জ্বল এবং সেই তারাটি আস্তে আস্তে আরো বড় হচ্ছে... বড় হচ্ছে... ঝন্টুর বুকটা ধবক করে উঠল। সত্যি কি সসার টসার কিছু আসছে নাকি? ঝন্টুর মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠে উপরের আকাশের তারাটা আরো বড় হয়েছে... এবং বড় হচ্ছেই... ঝন্টুর গলার কাছটা শুকিয়ে আসছে... একটু পানি খেলে হত... পিঠের শিড়দাড়ার কাছে কেমন ব্যাথা করছে...

এই সাব্বির?

সাব্বির থমকে দাঁড়াল। ঝন্টুর বড় বোন।

জি?

ঝন্টু তোর সঙ্গে ছিল না?

ন-ননাতো। ঢোক গিলে সাব্বির মিথ্যে কথা বলে।

ছোড়া গেল কই? ঝন্টুর বড় বোন বিড়বিড় করে আরো কি সব বলে সাব্বির বুঝতে পারে না, সে চট করে তাদের বাসায় ঢুকে পড়ে।

রাত ন'টা নাগাদও যখন ঝন্টু বাড়ি ফিরল না তখন সবাই ঝন্টুকে খুঁজতে বেরল। প্রথমেই গেল সেই পোড়ো বাড়ির ছাদে। না সেখানে নেই। আশে পাশে কোনো বন্ধুর বাড়িতেও পাওয়া গেল না তাকে। সাব্বিরকে একাধিকবার জেরা করা হল, সাব্বির স্বীকার করল না যে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে আর ঝন্টু এক সাথে ছিল। সে বলল তিনটা পর্যন্ত এক সাথে ছিল

তারপর তারা দুজন দুদিকে গেছে। মিথ্যা বলে পার পেলেও প্রচণ্ড চিন্তা হচ্ছে সাক্ষিরের। গেল কোথায় ঝন্টু? ঝগড়াটা না করলেই বোধহয় ভালো হত। সাক্ষিরের দোষ কি? হঠাৎ উল্টা পাল্টা বলে রাগিয়ে দিল। নিজের ঘরে বসে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা হচ্ছে সাক্ষিরের।

এই সময় কে যেন মিহি স্বরে ডাকল—

সাক্ষির... সাক্ষির...

কে?

আস্তু। জানালার কাছে আয়।

সাক্ষির ছুটে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল। দেখে নিচে ঝন্টু দাঁড়িয়ে তাকে দেখে চোঁটে আঙুল চাপল। তারপর ইশারা করল জানালা দিয়ে নেমে আসতে। সাক্ষির জানালা উপরে নিচে ঝাঁপ দিল।

এখানে কি করছিস? তোকে সবাই খুঁজছে।

জানি।

তাহলে? কি হয়েছে তোর কোথায় ছিলি?

ওরা এসেছে।

কারা?

এ্যালিয়েন।

মানে কি সব বলছিস?

চল দেখবি। ঝন্টু হাতের ইশারায় এগুতে বলে। দুজনে এগিয়ে তাদের বাড়ির পিছন দিয়ে একটা সরু পথ, সেটা পার হয়ে খোলা মাঠ। মাঠের পর একটা বেশ বড়সড় ডোবা, এদিকটায় কেউ আসে না। ডোবাটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল।

ঐ দেখ ফিসফিস করে ঝন্টু।

সাক্ষির হতভম্ব হয়ে দেখে সেই ডোবার উপর বড় খালার মতো একটা কিছু ভাসছে। ডোবার পানিটা বিজবিজ করে ফুটছে। হালকা নীল একটা আলো মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে বেরুচ্ছে নিচ দিয়ে যেটার কারণে ডোবার ঘোলা পানিটা মাঝে মধ্যেই নীল হয়ে উঠছে।

দেখলি?

সূর্য যেখানে নীল-৫

হু। সাক্ষিরের গলা দিয়ে যেন বাক্য সরে না।

এটাই সসার।

ভিতরে কেউ আছে?

আছে এ্যালিয়েন। ভিন্নগ্রহের প্রাণী।

দেখেছিস?

না।

তাহলে বুঝতে পারলি কিভাবে?

ওরা আমার সাথে যোগাযোগ করছে।

কিভাবে?

জানি না তবে বুঝতে পারছি...এখনি ওরা চলে যাবে।

কিভাবে বুঝলি?

আমি বুঝতে পারছি... ঐ দেখ।

সাক্ষির দেখল ডোবার পানিটার ভিতরের আলোটা আগে নিভছিল আর জ্বলছিল। এখন স্থির হয়ে গেছে... আলোটা আর নীল নেই, আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠছে। পানির বিজবিজ শব্দটা বাড়ছে। এখন টগবগ শব্দ হচ্ছে। তার মানে ডোবার পানিটা রীতিমতো ফুটছে... তারপর হটাৎ একটা গরম বাতাসের ঝাপটা খেল ওরা দুজন... মুহূর্তে ডোবাটা আগের মতো শূন্য হয়ে গেল। কিছু একটা ছুটে গেল আকাশের দিকে।

চল জলদি

কোথায়?

ঐ পোড়ো বাড়ির ছাদে।

ছাদে কেন?

চল না... ছাদে না গেলে ওদের হিসেবের গোলমাল হয়ে যাবে।

কি বলছিস?

ঠিকই বলছি। ঝন্টু সাক্ষিরের হাত ধরে ছুটতে লাগল।

ছাদে বসে আছে ঝন্টু আর সাক্ষির।

তুই এ্যালিয়েন বিশ্বাস করিস?

করি । তুই?

আমিও করি ।

সেদিন ডিসকভারি চ্যানেলে দেখিয়েছে ।

কি দেখিয়েছে?

বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর একটা ডকুমেন্টারির মতো... উনি বলেছেন...

কি বলেছেন?

উনি বলেছেন... তিনি এ্যালিয়েনে বিশ্বাস করেন এবং মহাবিশ্বে অবশ্যই এ্যালিয়েন আছে ।

কি আশ্চর্য!

কি?

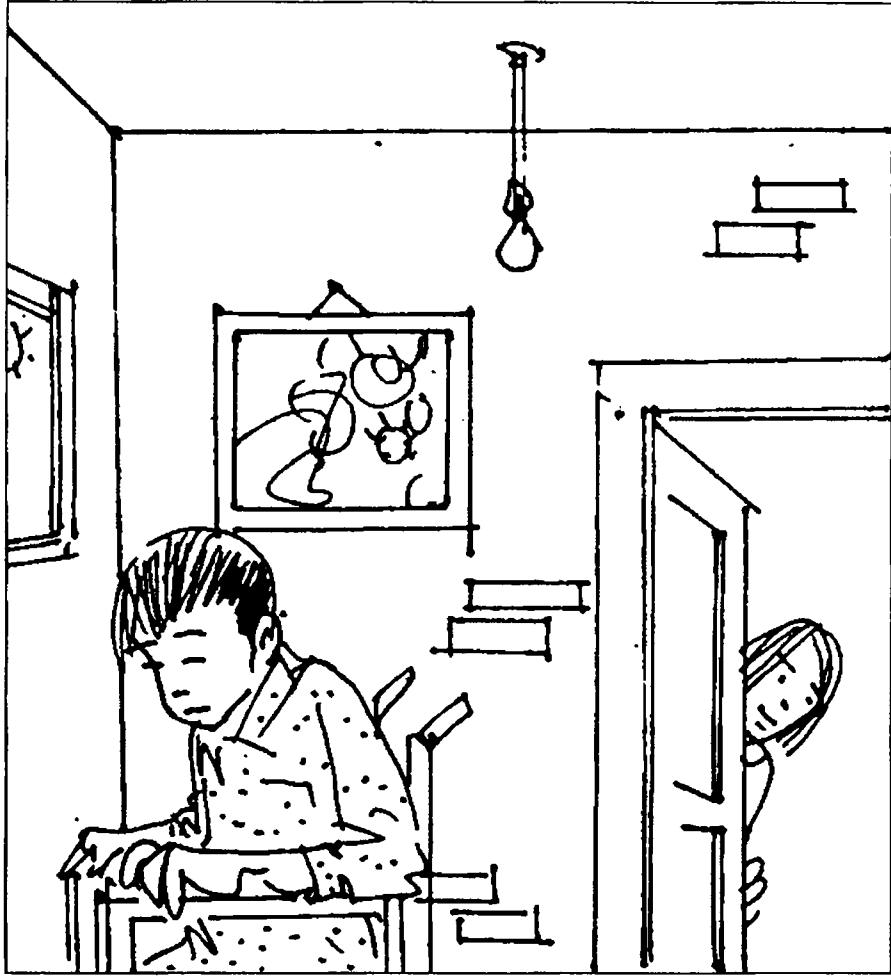
এই কথাগুলো মনে হচ্ছে আমরা দুবার বলছি । সাক্ষির আশ্চর্য হয়ে বলে ।

ঠিকই ধরেছিস । আগেও আমরা এইরকম কথা বলেছিলাম । রিপিট করছি ।

কেন?

ওরা সময়টাকে ঠিক করে নিচ্ছে । ওরা দ্বৈত সময়ের এ্যালিয়েন । যাওয়ার সময় আমাদের ব্যবহার করে সময়টাকে ঠিক করে নিয়েছে । চল বাড়ি ফিরি ।

সাক্ষিরের মাথায় কিছুই ঢুকলো না (এই গল্পের লেখকের মাথায়ও!) তারা নিঃশব্দে বাড়ির পথে হাঁটা দিল প্রতিদিনকার মতো যেন কিছুই ঘটেনি । কিছুই জানে না ।



## অটিস্টিক

নিতু সেভেনে পড়ে, আর তার চেয়ে দু বছরের বড় ভাই সজল পড়ে না। তবে একটা বিশেষ স্কুলে যায়। মা নিয়ে যায় মাঝে মাঝে বাবাও নিয়ে যায়, আবার নিয়েও আসতে হয়। অথচ দু বছরের ছোট বোন নিতু দিব্যি একা একাই পাশের বাসার এক বান্ধবীর সাথে একাই স্কুলে যায়। আসেও। অবশ্য এর একটা কারণ আছে সজল জন্ম থেকে অটিস্টিক।

বাবা-মা দু'জনেই তাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তা করে। নিতু বোঝে। সজল চুপ চাপ বসে থাকে কথা বলে না। মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায় কোনো কারণ ছাড়াই সেটা অবশ্য অল্প কিছুক্ষণের জন্য।

বাবা সজল অটিস্টিক কেন? নিতু একদিন প্রশ্ন করে বসে, ‘অটিস্টিক মানে কি?’

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। পরিস্কার করে কিছু বলেন না। বিড়বিড় করে বলেন, ‘অনেক কারণ আছে... মানুষই এর জন্য দায়ী... পৃথিবীর পরিবেশ আমরা ধ্বংস করেছি... যে শিশু দিগন্ত দেখে না তার ভিশন তৈরি হবে কোথেকে...’

বাবা ভিশন কি?

বাবা বিরক্ত চোখে তাকান নিতুর দিকে। নিতু সরে পড়ে। সোজা গিয়ে ঢোকে সজলের ঘরে। সজলের আলাদা একটা ঘর আছে। সেটা বিশেষ ভাবে সাজানো। তার বিশেষ স্কুলের একজন টিচার মাঝে মাঝে আসেন। তার নির্দেশেই সজলের ঘরটা সাজানো হয়েছে।

এই সজল কি করিস? সজল অবশ্য কথা বলে না, ঘাড় ঘুরিয়ে কেমন ভাবে তাকায়। মার কড়া নির্দেশ আছে সজলকে সজল ভাইয়া ডাকতে হবে তুই তুকারি করা যাবে না। কিন্তু নিতু মায়ের এই নিয়ম মানে না। ওর ঘরে ঢুকলেই এভাবে কথা বলে। যেন বয়সে বড় সজল তার স্কুলের কোনো বান্ধবী।

এই সজল কি করিস? আবার একই প্রশ্ন করে নিতু। সে ভালো করেই জানে সজল কথা বলবে না। তারপরও সে বক বক করে...

আচ্ছা সজল তুই কি কখনই কথা বলবি না?

(সজল নিরুত্তর)

কেন? কথা বললে কি হয়?

(সজল নিরুত্তর)

আচ্ছা আমি তো তোরা ছোট বোন তোরা একটু কথা বলতে ইচ্ছে করে না আমার সাথে? কিন্তু আমারতো ইচ্ছে করে নাকি?

(সজল নিরুত্তর)

আচ্ছা তোকে তুই বলি দেখে তুই রাগ করিস নাকি? এ জন্য কথা বলিস না?

ঠিক তখন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। নিতুর মাথার মধ্যে কে যেন বলল, ‘না’ স্পষ্ট শুনলো নিতু ঠিক শুনলো বলাটা ভুল হবে... মানে বুঝলো।



তুই কি আমার সাথে কথা বললি?

আবার ব্যাপারটা ঘটলো তার মাথার ভিতর কেউ বলল, ‘হ্যাঁ’। নিতু খেয়াল করল। সজল তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। অন্তত তার তাই মনে হল।

বাহ মজারতো, মাথার ভিতর কথা বলিস কিভাবে? নিতুর ব্যাপারটা বেশ মজাই লাগে।

(মাথার ভিতর- ‘আমরা ইচ্ছে করলে পারি’)

তাহলে এতদিন ইচ্ছে করলি না কেন?

(মাথার ভিতর- ‘এতদিন ইচ্ছে করেনি তাই বলিনি আজ ইচ্ছে করল বললাম’)

একটু আগে বললি আমরা ইচ্ছে করলে পারি আমরা কারা?

(মাথার ভিতর- ‘তোরা যাদেরকে অটিস্টিক বলিস’)

আচ্ছা তোরা আলাদা কেন?

(মাথার ভিতর- ‘আমরা আধুনিক মানুষ’)

মানে?

(মাথার ভিতর- ‘আমরা আগামী পৃথিবীর আধুনিক মানুষ’)

তার মানে তোরা আমাদের থেকে বুদ্ধিমান?

(মাথার ভিতর- ‘অবশ্যই’)

তাহলে এতদিন আমাদের সাথে কথা বলিস নি কেন?

(মাথার ভিতর- ‘পিপড়ে, ডলফিন, অক্টোপাস এরা অনেক বুদ্ধিমান প্রাণী কিন্তু তোরা ইচ্ছে করলেই কি ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবি? না পারিস’)

না তা পারি না... এর সাথে তোর বুদ্ধিমান হওয়ার সম্পর্ক?

(মাথার ভিতর- ‘এই একই কারণে আমরাও তোদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি না। আমাদের তুলনায় তোদের বুদ্ধিমত্তা অনেক নিচে’)

কিন্তু এই যে আমার সাথে মাথার ভিতর দিব্যি কথা বলছিস?

(মাথার ভিতর- ‘ঐ যে বললাম... আমরা ইচ্ছে করলে পারি... খুব বেশি ইচ্ছে করলে পারি। আসলে এভাবে কথাবার্তা শুরু করলে তোরা ভয় পাবি তাই বলি না...’)

কই আমি তো ভয় পাই নি ।

(মাথার ভিতর- ‘হ্যাঁ...তাইতো তোর সাথে যোগাযোগ করলাম’)

আচ্ছা মাঝে মাঝে তুই ক্লেপে যাস কেন? মাকে কষ্ট দিস?

(মাথার ভিতর- ‘আমরা নেটওয়ার্কে যখন সবাই কথা বলি তখন মা খেতে জোর করলে আমি রেগে যাই ’)

আচ্ছা তাহলে আমি মাকে বলে দিব এমন না করতে ।

(মাথার ভিতর- ‘না মাকে বলবি না কিছু... তাহলে তোর সাথেও যোগাযোগ বন্ধ করে দিব আমি ।’)

আচ্ছা বলব না ।

এই সময় মা ঢুকলেন খাবার প্লেট নিয়ে । ‘এই নিতু তোকে না বললাম ওকে বিরক্ত করবি না? ’

বিরক্ত করলাম কোথায়? ওর সাথে কথা বলছিলাম ।

দেখ নিতু বাজে কথা বলবি না । ওকে কেন বিরক্ত করছ? ওর সঙ্গে একা একা ফালতু বকবক করে ওর মাথাটা ধরিয়ে দিও না । ডাক্তার বলেছে ওর ভাল বিশ্রাম দরকার । এখন যাও টেবিলে ভাত দেয়া হয়েছে ।

নিতু চলে গেল । যাওয়ার সময় তাকাল সজলের দিকে । এই সময় তার মাথার ভিতর সজল বলল, ‘আমার সঙ্গে তোর জোরে জোরে কথা বলার দরকার নেই । মনে মনে বললেও আমি বুঝতে পারব । মনে মনে কথা বললে মা তোকে বকবে না ।’ নিতু মনে মনে বলল, ‘সত্যি?’

মাথার ভিতর সজল বলল, ‘হ্যাঁ সত্যি...’

বেশ ভালোই চলছিল নিতুর আর সজলের কথা-বার্তা । দু’জন দু’ঘরে থাকলেও কথাবার্তা চলতো মনে মনে আর মাথায় মাথায় । একবারতো স্কুলে নিতু আটকে গেল একটা অংক করতে গিয়ে । বোর্ডে অংক করতে হবে । অংক স্যার তাদের খুব ভালো স্যার কিন্তু কি কারণে সেদিন অংক স্যার আসেন নি । তার বদলে বদরাগী হেড স্যার এসে হাজির । তিনি আজ অংক স্যারের বদলি ক্লাশ নিবেন । তার ক্লাশ মানেই ভয়াবহ ব্যাপার ।

এই মেয়ে উঠে দাঁড়াও । নিতুর কলজে নড়ে গেল । হেড স্যার তার দিকে আঙুল ধরে রেখেছেন । তার মানে তাকেই উঠে দাঁড়াতে হবে । ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল নিতু ।

বোর্ডে চলে আস ।

গেল নিতু ।

এই অংকটা বোর্ডে কর । সর্বনাশ এই অংকের চ্যাপ্টারের অংক যেদিন অংক স্যার করিয়েছিলেন সেদিন নিতু স্কুলে আসে নি । জ্বর ছিল । সে কি করে এই অংক করবে? তার হাত কাঁপতে লাগল । হেডস্যার মেঘস্বরে বললেন—

কি হল চক নিয়ে বোর্ডে যাও ।

চক নিয়ে বোর্ডে গেল নিতু । আর তখনই ফিসফিস করে সজলকে ডাকল—

সজল?

(বল শুনছি)

আমি তের অনুশীলনীর প্রথম অংকটা পারি না । বোর্ডে করতে হবে ।  
(তুই লিখতে থাক আমি বলছি...)

তারপরতো ইতিহাস... ঘষ ঘষ করে মুহূর্তে অংকটা কষে ফেলল নিতু । এত দ্রুত করল যে হেড স্যারতো বেশ অবাকই হলেন । তিনি বলেই ফেললেন, ‘গুড গার্ল!’ নিতু অংক পারাতে স্যারের মুড ভালো হয়ে গেল । বাকি ক্লাশ স্যার আর অংক করালেন না । বিখ্যাত অংকবিদ রামানুজের গল্প করতে থাকলেন । তিনি ভারতে গিয়ে বিখ্যাত এই অংকবিদের ভিটে বাড়িতে গিয়ে ছিলেন... ইত্যাদি ইত্যাদি । সেদিন নিতুর জন্য পুরো ক্লাশ বেঁচে গেল । নইলে ... সে যাই হোক বাড়ি এসে নিতু সোজা সজলের ঘরে ঢুকে গেল ।

জোরে জোরেই বলে ফেলল, ‘সজল ভাইয়া মেনি মেনি থ্যাংকস... আজ থেকে তোমাকে তুমি করে বলব আর ভাইয়া ডাকব...খুশি?’

মাথার ভিতর সজল বলল, ‘না ।’

কেন?

‘আমরা পরিবর্তন পছন্দ করি না ।’

উফ তাহলে তোমরা আসলে কি চাও সত্যি করে বলতো?

‘আমরা এখন কিছু চাই না... প্রকৃতি... আগামী পৃথিবীর বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে ধীরে ধীরে আমাদের সংখ্যা বাড়াচ্ছে...এটা একটা সূক্ষ্ম বিবর্তন...’

ডারউইনের বিবর্তনের মতো?

‘হয়তবা...’

এই সময় যথারীতি মা সজলের জন্য পুটে করে খাবার নিয়ে ঢুকলেন ।  
নিতুকে দেখে প্রায় চোঁচিয়েই উঠলেন—

একি নিতু তুমি এখনো স্কুল ড্রেস বদলাও নি? এখানে এসে বকবক করে সজলের মাথা ধরিয়ে দিচ্ছ? যাও জলদি কাপড় বদলে গোসল সেরে আস । আমি সজলকে খাইয়ে ভাত দিচ্ছি তোমাকে ।

আচ্ছা বাবা... আচ্ছা... যাচ্ছি গোসলে । তারপরও নিতু যায় না । দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকায় সজলের দিকে । তার চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু রোগা-ভোগা তার অটিস্টিক ভাইটা ঘাড় গুজে অসহায়ের মতো মায়ের তুলে দেওয়া ভাত খাচ্ছে... কিন্তু সে আসলে আগামী পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ, এই খবরটা চোঁচিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করে... নিতুর! কিন্তু বলে না! প্রকৃতিই একদিন বলবে ।



### সিসটেম ম্যান

বুঝালা ঐ রোকন স্যার কিন্তু আসলে মানুষ না ।

মানে?

মানে ভূত বা জিন একটা কিছু হইব ।

কেন? এরকম ভাব কেন?

আরে ঐ শালার টেবিলে আমি কায়দা করে বহু পেভিং ফাইল গছায়া  
দিছি আর আশ্চর্য কি জানিস?

কি?

সবগুলো ফাইল সে খুব সুন্দর করে কাজ শেষ করে বড় স্যারের কাছে পাঠায়া দেয়। জিজ্ঞাসাও করে না এই ফাইল তার টেবিলে গেল কিভাবে? বড় স্যার তো সেদিন আমাকে ডেকে পর্যন্ত প্রশংসাও করলেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ

ভালোইতো

ভালোনা। মোটেই ভালো না। বজলু দাঁত-মুখ শক্ত করে একটা সিগারেট ধরায়। বজলু আর রমিজ অফিসের বাইরে একটা টঙের দোকানে চা খেতে এসেছে। তাদের অফিসে চমৎকার কেন্টিন আছে কিন্তু এরা দুজন মাঝে মধ্যে বাইরে চলে আসে চা খেতে। কিছু গোপন কথা চালাচালি করে। সব কথা কি আর অফিসের কেন্টিনে বলা যায়? যেমন আজ তারা এসেছে।

ভালো না ব্যাপারটা মোটেই ভালো হচ্ছে না। ঐ রোকন স্যারের সরাসরি দিতে হবে

মানে?

তুই বুঝতে পারছিস না। ও অফিসের সব কিছু বদলে দিচ্ছে। অফিসে এখন কেউ ঘুম খায় না। কোনো ফাইল পেভিং থাকে না। সব কিছু কিভাবে কিভাবে সে যেন বদলে দিচ্ছে।

শালা মনে হয় সামনে ইলেকশন করবে।

আরে না এই লোক সেই টাইপ না।

তাহলে?

এ ভালো লোক। বেশ লোক। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই জামানায় ভালো লোক থাকার কথা না। এ মানুষ না, এ অন্য কিছু।

আরে ধুর তোর মনে খামাকা প্যাঁচ...

আরে কি আশ্চর্য... তুই জানিস আমি গত মাসে বাড়ি ভাড়া দিতে পারি নাই?

মানে?

মানে আমি যে বেতন পাই তাতে কি গুলশানের ঐ রকম বাড়িতে থাকতে পারি? অফিসের অফিস এক্সেসরিজের সাপ্লাইয়ের কাজটা আমার হাতে ছিল। ঐ খান থাইকা টু পাইস করতাম। এখন ঐ সাপ্লাই বন্ধ।

তাহলে এখন সাপ্লাই দিচ্ছে কে?

সেটাইতো আশ্চর্য কেউ সাপ্লাই দিচ্ছে না। সাপ্লাই বন্ধ কিন্তু জিনিসের অভাব নাই।

কিছু বুঝলাম না।

এ জন্যই তো কই ঐ শালা মানুষ না। ঐ শালা সারাদিন নিজের চেয়ারে বসে থাকে খাইতেও দেখি না।

আমিও দেখছি সবসময় কাজে বাস্তু। খাইতে দেখি নাই।

শোন আইজ রাতেই ওরে নিকেষ করতে হইব।

মানে?

মানে শালার লাশ ফালামু।

কি কন?

ঠিকই কইছি। ও যদি আর ছয় মাস এই অফিসে থাকে। আমার চাকরি থাকব না। জেলও হয় যাইতে পারে।

কেন?

শালায় আমার পুরান ফাইলে হাত দিছে... কেঁচো খুঁড়তে অজগর বারাইয়া যাইবো তাই আগেই... তাই ঠিক করছি...

কিন্তু...

এর মধ্যে কোনো কিন্তু নাই। তুই আমার লগে যাবি। শালাকে ফলো করুম তারপর নিরিবিলিতে ঠুস... বজলু রমিজের একটা হাত নিয়ে তার কোমরে ঠেকায়। শিউরে ওঠে রমিজ আলী। বজলু ভয়ঙ্কর লোক সে ভালো করেই জানে। অফিসের কিছু অনৈতিক কাজে সে বজলুর সাথে ছিল। অর্থনৈতিক ভাবে বেশ লাভবানও হয়েছে। কিন্তু এখন সরে আসতে পারছে না।

ইয়ে দোস্তু... রমিজ ঢোক গিলে কিছু বলতে চায়। তখনই চোখ সরু করে তাকায় বজলু। বজলুর এই দৃষ্টিটাকে সে ভয় পায়। কিছু বলতে গিয়েও বলে না।

আর কোনো কথা নাই। তুই আমার সাথে যাবি। অফিস ছুটির পর।

অফিস ছুটি হয়ে গেছে পাঁচটায় কিন্তু তিন তলার কর্নারের রুমটায় আলো জ্বলছে। ওখানে রোকন স্যার কাজ করছেন... ‘দ্যা সিস্টেম ম্যান’ তাকে সবাই আড়ালে ‘সিস্টেম ম্যান’ ডাকে কারণ সে অফিসটাকে একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসছে। আরে কি আশ্চর্য কথা, দেশ চলবে দেশের মতো দুর্নীতি চলবে... মানুষ ঘুষ খাবে... দুই নম্বর করে বড়লোক হবে... খুন খারাবি থাকবে... সবই থাকবে আর কি আশ্চর্য এই লোকটা নেমেছে অফিসের চেহারা বদলাতে। আরে হারামজাদা তাকে কে বলেছে এসব করতে? নয়টা-পাঁচটা চাকরি করবি মাস শেষে বেতন নিয়ে চলে যাবি, এর মধ্যে... এতসব কি?

বজলু ভাই সাতটার উপরে তো বাজে।

বাজুক নটা বাজলেও আজ শালারে ধরতে হইব। বজলু মিয়া সিগারেট ধরায়। রমিজ সিগারেট খায় না। একটা পান কিনে চিবোয়। তার মোটেই ভালো লাগছে না। কেন যে এই বজল্যার সাথে ভাজ খেয়ে... তখন কিছু টাকা-পয়সা হাতাতে গেল এখন সে আটকে গেছে। নিজেকে নিজে গালি দেয়।

বজলু ভাই।

বল।

একটা কাজ করলে হয় না?

কি কাজ?

ওরে জানে না মারলে হয় না? হাত-পা ভাইজা দিলাম।

চুপ চুপ... ঐ যে বাইরাইছে।

ওরা দুজন দেয়ালের পাশে চেপে গেল। তারা দেখল রোকন আলি দ্রুত হাঁটছে। নিরাপদ দূরত্ব রেখে তারা তাকে ফলো করতে লাগল। রোকন আলী বাসে উঠল না। রিক্সাও নিল না, কোনো সিএনজিকে ডাকলো না। অত্যন্ত দ্রুত পা ফেলে হাঁটতে লাগল। বজলু আর রমিজকে মোটামুটি হিমসিম খেতে হচ্ছে তাকে অনুসরণ করতে।



দেখছস কইছি না শালা আসলে মানুষ না কত জোরে হাঁটে । দাঁড়া  
একটু ফাঁকা রাস্তা পাইলেই হইছে ।

রমিজ কথা বলে না, দ্রুত পা ফেলে বজলুকে অনুসরণ করে । তার  
ভালো লাগছে না । মাঝে মাঝে ইচ্ছে হচ্ছে পিছন ফিরে টানা দৌড় দিতে ।  
পারছে না ।

একটা ফাঁকা রাস্তায় ঢুকতেই বজলু আর দেরি করল না । দ্রুত পিস্তলটা  
হাতে নিয়ে এল । এই চাল । সে দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে যাবে ঠিক তখনই  
একটা বড় গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ।

গেল কই?

ঐ গাছটার পিছনে... মনে হয়...

কি মনে হয়?

মনে হয় প্রস্রাব করতে খারাইছে ।

ওরাও দাঁড়িয়ে গেল । আর ঠিক তখনই যেন মাটি ফুড়ে বেরুল তাদের  
ঠিক পিছনে একটা মানুষ... ওরা তাকিয়ে দেখে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে  
রোকন আলী ।

আরে আপনারা? বজলু আর রমিজ?

টোক গেলে রমিজ । বজলুও একটু হতভম্ব ।

তখন থেকেই দেখছি আপনারা আমাকে ফলো করছেন । বিষয় কি?  
বজলুর হাতে পিস্তল কেন? কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র । বজলু সামলে নেয়  
নিজেকে । ঝট করে পিস্তলটা চেপে ধরে রোকন আলীর পেটে । তারপর  
চিবিয়ে চিবিয়ে বলে—

রোকন মিয়া তুমি শেষ... সিসটেম ম্যান হইছ না ? আমার দুই নম্বর  
ফাইলে হাত দিছ? সে আর দেরি করে না । ট্রিগারে টান দেয় । রোকন  
আলী একটু কঁপে ওঠে, তারপর আছড়ে পড়ে পিছনের গাছটায় । মুখে  
কোনো শব্দ করে না ।

বজলু পিস্তলের নলের মুখে ফুঁ দিয়ে ধোঁয়াটা সরায় সিনেমার নায়কের  
মতো । তারপর তাকায় রমিজের দিকে । রমিজ উপুড় হয়ে বসে হড়হড়

করে বমি করছে। রোকন আলী পা ভাজ করে বসে পড়ে তারপর কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ে গাছটার পাশে। তার সাদা শার্টে রক্তের একটা ধারা...

পরদিন রমিজ অফিসে গেল না। বজলু ঠিকই গেল। অফিসে ঢোকান আগে অবশ্য দু-একটা পেপার দেখল, কোথাও খবরটা বের হয়েছে কিনা টয়েনবি সার্কুলার রোডের মাথায় খুন হওয়ার কোনো ঘটনা... না ছাপা হয় নি। অবশ্য ঢাকা শহরে এত খুন খারাবি হয় আজকাল যে এসব ছোটখাট খবর কোনো খবর না। তারপর ফোন দেয় রমিজকে। রমিজের ফোন বন্ধ। একটা সিগারেট ধরায়। তার আজ বেশ ভালো লাগছে। সিগারেটটায় শেষ সুখটান দিয়ে ছুড়ে ফেলে অফিসে ঢোকে। তার সীট নিচ তলায়। কিন্তু সোজা তিনতলায় চলে যায়। রোকন স্যারের রুমের দরজাটা আধা-খোলা। রোকন স্যার যে তার টেবিলে বসে নেই এই দৃশ্যটা দেখা দরকার।

কিন্তু উঁকি দিয়েই জমে গেল বজলু। রোকন আলি বসে কাজ করছে। বজলু দরজায় দাঁড়িয়ে দেখেই যেন চোঁখ তুলে তাকাল রোকন স্যার। বজলুকে দেখে হাসিমুখে বললেন—

বজলু কি খবর? ভিতরে আস।

মন্ত্র মুণ্ডের মতো বজলু গিয়ে দাঁড়ায় রোকন স্যারের টেবিলের সামনে। তার মাথা কাজ করছে না। এটা কি করে সম্ভব নিজের হাতে গুলি করে মেরেছে গত রাতে যাকে, সে এখন অফিস করে কিভাবে?

বস বজলু, তোমার সাথে কথা আছে।

বজলু বসে। কলমের মুখ বন্ধ করে রোকন স্যার হাসিমুখে তাকায় বজলুর দিকে। তারপর ফিস ফিস করে বলে—

বজলু গত রাতে তুমি আমারেই গুলি করছিলো... দেখতেই পারতাম মরি নাই আসলে তুমি গুলি করলে হবে না। আমার মরা আসলে আমার হাতে নেই। আমি আসলে একটা মিশনে আসছি। আমি একা না আমার মতো হাজার হাজার মানুষ বদলে যাওয়া মিশন নিয়ে কাজ করতে আসছে... আমরা পৃথিবীটারে বদলায়া দিব... এই পৃথিবীতে কোনো খারাপ কিছু থাকবে না... সব ভালো হয়ে যাবে...

কি-কিছুস্যার এটাতো নিয়ম না পৃথিবীর ।

ঠিক ধরু । এটা পৃথিবীর নিয়ম না । তোমাকে সত্যি কথাটা বলি  
এই পৃথিবীটা আসলে একটা গেম । কম্পিউটারের গেমের মতো একটা  
খেলা... তোমাদের বাচ্চারা খেলে না?

জি খেলে...

খেলা নষ্ট হয় কখন? যখন খেলার একটা নির্দিষ্ট সিস্টেমের ভিতর  
আরেকটা সিস্টেম ঢোকে... আমরা সেইরকম আরেকটা সিস্টেম...! রোকন  
স্যার মিটিমিটি হাসে । বজলু'র মুখ হাঁ হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে লোকটা  
আসলেই মানুষ না... !